তাম্বূল বণিক্।

তাম্বূল বনিক্

বা

বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্যজাতির ইতিহাস।

জাতিতত্ত্ব

ও

সৎশূদ্রের বৈশ্যত্ব বিষয়ক প্রস্তাব

সম্বলিত।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত সম্পাদিত।

এষাঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা।
(বৃষলত্বংগতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ।)

শুদ্ধিতত্ত্ব।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে॥

বৃহস্পতিঃ।

১৩১০।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিজ্ঞপ্তি।

১৩০৪ বঙ্গাব্দে নব্যভারতে "বাঙ্গালী বৈশ্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৮ অব্দের আশ্বিন মাসে মহাজন বন্ধুর অতিরিক্ত সংখ্যায় "তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়" নামে অন্য একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। এতদুভয় অবলম্বনে বর্ত্তমান পুস্তক সঙ্কলিত হইল। এতৎ সম্পাদন কল্পে আমি অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি। স্থল বিশেষে তাঁহারা কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার অবসর পাই নাই। এজন্য আমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটি হইয়াছে। বাঙ্গালী বৈশ্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার সময়, আশা করিয়াছিলাম, কোন উপযুক্ত লেখক বিস্তৃতভাবে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিবেন; এ পর্য্যস্ত কাহাকেও উদ্যোগী না না দেখিয়া শারীরিক অপটুতা সত্ত্বে পুনর্ব্বার আমাকে অগ্রসর হইতে হইল। আমার উক্তি অন্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া রচনা কার্য্য সমাধা হইয়াছে। তাম্বূলী সভার প্রথম অধিবেশনের দিন রাজকীয় জাতিতত্ব নির্ণায়ক কার্য্যালয়ে প্রদত্ত ইংরাজী অনুবাদ সমেত তাম্বূলীকুলের সম্বন্ধ নির্ণয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ "বঙ্গীয় তাম্বূলী বৈশ্য" নামে প্রচারিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ তাহার পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণ। সৎশূদ্রের অন্তর্গত বৈশ্যশাখায় অপর জাতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিয়াছি, অতএব জাতিতত্ত্ব অনুসন্ধানকারী পাঠকমাত্রকে অনুরোধ করিতেছি, কৃপা করিয়া পুস্তক খানি পাঠ করিবেন।

কাশীধাম।
ফল্গুৎসব।
সম্বৎ ১৯৫৯

শ্রীদুর্গাচরণ ভুতি।

সূচী।

উপক্রমণিকা।

সম্বন্ধ-নির্ণয়।

বর্দ্ধমানের আদি ৪২ গ্রামী সমাজ।

বৈঁচির ১৪ গ্রামী সমাজ।

বিষ্ণুপুরের বর্দ্ধমানিয়া ৪২ গ্রামী সমাজ।

বাঁকুড়ার রাজহাটী সমাজ।

জাহানাবাদের অষ্টগ্রামী সমাজ।

মেদিনীপুরের চতুর্গ্রামী সমাজ।

হুগলির দক্ষিণদাঁড়া ৪২ গ্রামী সমাজ।

কুশদহের সপ্তগ্রামী সমাজ।

দুবরাজপুরের পল্লী ৪২ গ্রাম সমাজ।

বনকাটি "গোয়ালপেড়ে" অষ্টগ্রামী সমাজ।

কোতরাপুরের উৎকল অষ্ট-গ্রামী সমাজ।

খড়্গপুরের "সংসেরে" ৪২ গ্রামী সমাজ।

সমাজ ভেদ।

বিবাহ পদ্ধতি।

বৈশ্যত্বের আলোচনা।

পরিশিষ্ট।

কলিকাতা,

শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কটন ষ্ট্রীট ১৫৩/১ সংখ্যাত গৃহে প্রাপ্য।

আর্য্যযন্ত্র, ফাইনআর্টপ্রিণ্টিং সিণ্ডিকেট ও হরিযন্ত্র।

২৫ নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গীয়

তাম্বূলী বৈশ্য।

উপক্রমণিকা।

জগতে কোন জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ্ এক রূপ থাকে না। সকলেই কাল সহকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ পরিবর্ত্তন আন্তরিক, কেবল বাহ্যিক নহে। ইহাতে শুদ্ধ গুণান্তরাধান হয় এমন নহে, ইহাতে প্রকৃতিগত প্রভেদও জন্মে। এই পরিবর্ত্তনবশে এক জাতীয় জীব বা উদ্ভিদ্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ অন্য এক জাতীয় জীবের বা উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। ভূতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, যে অগ্রে এই পৃথিবীতে উদ্ভিদ্ ও জীবের কতিপয় জাতি মাত্র বিদ্যমান ছিল, পরে অসীম কাল সহকারে তাহা হইতে অসংখ্য জাতীয় উদ্ভিদ্ ও জীবের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া সর্ব্বশেষে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। ভূপঞ্জরের নিম্নতর স্তরে অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক জীবের ও উদ্ভিদের চিহ্ন পাওয়া যায়, কিন্তু যত উর্দ্ধস্থিত স্তরে উঠা যায়, তত অধিক সংখ্যক জাতির উপলব্ধি হইতে থাকে। ভূমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন ভিন্ন যুগে সংঘটিত হইয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বতন কালে অল্প সংখ্যক জাতি বিদ্যমান ছিল; অধুনাতনকালে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই যে ক্রমশঃ অধিকতর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা কখনই শূন্য হইতে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতি হইতেই উত্তরোত্তর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা এক জাতি হইতে অন্য জাতির এরূপে প্রাদুর্ভাব হয়, অথবা সৃষ্টি-পারম্পর্য্য বিধৃত থাকে, তাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ বলে। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে যাহা সারযুক্ত ও গুণসম্পন্ন, তাহা রক্ষিত হয় এবং যাহা নিস্তেজ ও নিকৃষ্ট, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনবলেই ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ্ বা জীব আপন হইতে উৎকৃষ্ট জাতির উৎপাদন করিয়া ক্রমে হ্রাস হইয়া, হয়, এককালে

বিলুপ্ত হয়, না হয় হীনভাবে অবস্থান করে। এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বলেই সূক্ষ্ম হইতে স্থূল, নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্ট, ঋজু হইতে জটিল ক্রমশই উদ্ভূত হইতেছে।

এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অথবা যোগ্যতরের সংরক্ষণ নিয়মানুসারেই কালে কালে এই পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির আবির্ভাব হইয়াছে। মনুষ্য যে সৃষ্টির নিয়মাতীত হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে অথবা একেবারে' আকাশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে তাহা নহে। যে নিয়মে কালে কালে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, যে নিয়মে উদ্ভিদ্ প্রস্তর ও অপরাপর জীব জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, সেই একই নিয়মবলে মনুষ্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। কি জড় প্রকৃতিতে, কি জীব প্রকৃতিতে, যত প্রক্রিয়া হইতেছে, তৎসমস্তই চিরস্থায়ী নিয়মের অধীন। তাহারা যে সময়ে সময়ে কোন স্বতন্ত্র শক্তির পরিচালন প্রভাবে ঐরূপ হইতেছে তাহা নহে। তৃণ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমুদয় জাতি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে যথাক্রমে উদ্‌ভূত হইয়াছে। জাতি সকল যদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে তাহাদের আকার প্রকার অবস্থা কার্য্য প্রভৃতি সর্ব্বতোভাবে বিসদৃশ ও বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে কি জড় রাজ্যে, কি উদ্ভিদ্ রাজ্যে, কি জীব রাজ্যে, সৃষ্টির সর্ব্বত্রই ধারাবাহিক শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে—যখন কি দৈহিক বিষয়ে, কি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে, কি প্রজনন ক্রিয়ায়, কি মানসিক গুণে, অনেক বিষয়ে জীব রাজ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের ঐক্য আছে, তখন একই জীব হইতে যে অন্য জীবের সৃষ্টি বা রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে জাতি সকল এ প্রকার পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন গৃহপালিত জন্তুর এত পরিবর্ত্তন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদ নিবন্ধন একটী ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপন্ন হইতেছে, যখন অবস্থাভেদে নিবন্ধন শোণিত শুক্রের পরিণামে আশ্চর্য্য মানব দেহ উদ্‌ভূত হইতেছে, তখন ভূমণ্ডলে নূতন জাতি পরম্পরার উৎপত্তিও যে অবস্থাভেদ নিবন্ধন সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। জাতি সকল যদি পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে কোন্ গুলি জাতি, কোন্ গুলি বা এক জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী, তাহা লইয়া এত বিসম্বাদ ঘটিত না। বর্ত্তমান জাতি-

পরম্পরায় নিম্ন হইতে নিম্নতর ও উচ্চ হইতে উচ্চতর শৃঙ্খলা যেরূপ সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে, তাহাতে ক্রমিক প্রাদুর্ভাবই দেখা যায়। নতুবা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম যুগে সরীসৃপের উৎপাদন করিলেন, তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া মৎস্য জাতির সৃষ্টি করিলেন, অনন্তর আর এক যুগে তির্য্যক্ জাতির সৃষ্টি করিলেন, ইহা যুক্তি ও দৃষ্টান্ত বিরুদ্ধ।

ক্রম-প্রাদুর্ভাবের নিয়মানুসারে মানব যে নিম্ন জীব হইতে ক্রমশঃ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তৎপক্ষে সংশয় নাই। কেবল যে পৃথিবীর স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া সর্ব্বশেষে মানবের বিকাশ ইহা অনুমিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু নিকৃষ্ট জীবগণের সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায়ও একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মানব দেহের আন্তরিক গঠন ও ধাতু সকল পর্য্যালোচনা করিলে নিকৃষ্ট জীবের সঙ্গে সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য বোধ হয়। মাংসপেশী, শিরা, শোণিত প্রভৃতি নর-দেহে যেরূপ, অন্যান্য প্রাণীর দেহেও সেই প্রকার। অধিক কি, মস্তিষ্কেরও অবস্থা সর্ব্বত্র সমান দেখা যায়। নিকৃষ্টজীব সকল মানবের ন্যায় সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয় এবং উভয়েরই ক্ষত সংরোধ একই ঔষধে নিবারিত হয়। মনুষ্য স্তন্যপায়ী জাতির অন্তর্ভুক্ত। অপরাপর স্তন্যপায়ী জন্তুর সন্তানোৎপাদ-নাদি মনুষ্যের বংশবিস্তার কার্য্য অপেক্ষা পৃথক্ নহে। খাদ্যের গ্রহণ ও পরি-পাক এবং তন্নিবন্ধন শোণিতাদির উৎপত্তি মনুষ্যেও যেরূপ, অন্যান্য জন্তুতেও তদ্রূপ। গর্ভাশয়ে শোণিত ও শুক্র প্রথমে যে অবস্থায় থাকে, তাহা মনুষ্যের ও নিকৃষ্ট জীবের একই রূপ। মানুষের প্রাথমিক ভ্রূণ ও নিকৃষ্ট জন্তুগণের প্রাথমিক ভ্রূণ একই প্রকার। কেবল দেহের আভ্যন্তরিক গঠন ও প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কেন, অন্যান্য বিষয়েও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। মানবের ন্যায় নিকৃষ্ট প্রাণীরও পাঁচটী ইন্দ্রিয় আছে। সুখদুঃখ বোধ, ভয়, সন্দেহ, অপত্য স্নেহ প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল সর্ব্বসাধারণ। এই সকল ও অপরাপর নানা কারণে স্থির হইয়াছে, ক্রমপ্রাদুর্ভাবেই মানবজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পৃথিবীতে উদ্ভিদে ও জীবে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন এক কোটী শ্রেণীর জাতি আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এক কোটীবার ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি করিয়াছেন, না, জাতিপরম্পরা নিকৃষ্টতর জাতি হইতে পর্য্যায় ক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে?

মানব সৃষ্টি প্রকৃতির শেষ ও সর্ব্বোচ্চ সৃষ্টি। শুদ্ধ যে ভূপৃষ্ঠের স্তর

সকল পরীক্ষা দ্বারায় একথা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে। অনুমান বলেও আমরা একথা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। বৃক্ষ, লতা, ওষধি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, পর্ব্বত, হ্রদ, আকাশ প্রভৃতি সমুদয় স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টির পর তবে এই পৃথিবীতে মনুষ্যের আবির্ভাব হয়। মনুষ্যের জীবন ধারণ জন্য পৃথিবীস্থ সমস্ত দ্রব্যেরই প্রয়োজন। এই সমস্ত অগ্রে সৃষ্ট না হইলে মনুষ্য একদিনের জন্যও পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিতে পারিত না। পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের সহিতই মানবের সাম্যতা আছে। মানবের দেহরক্ষার জন্য উদ্ভিদ্ চাই, আকরস্থিত ধাতুপদার্থ চাই, সুদূর সমুদ্র গর্ভস্থিত মণি মুক্তাদির আবশ্যক—জলজ জন্তু ও স্থলজ জন্তু—সকলই মনুষ্যের প্রয়োজন। সমুদয় সৃষ্টি মন্থন করিয়াই বিধাতা মানবসৃষ্টি করিয়াছেন। মানব সমুদয় প্রকৃতিরই সার প্রতিকৃতি। সুদূর আকাশ স্থিত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীও মানব সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। সকলেরই সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধ আছে। মানব দেহের জন্য উদ্ভিদ্ রাজ্যে যাহা আছে, ধাতু রাজ্যে যাহা আছে, জীব রাজ্যে যাহা আছে, এমন কি জলরাজ্যে যাহা আছে, সমুদয়ই চাই। পার্থিব এমন কিছু নাই, যাহা মনুষ্যের প্রয়োজনে লাগে না। আবার মানব মনও সমুদয় জীব রাজ্যের মনের সমষ্টি। সর্পের যে ক্রূরতা, শৃগালের যে ধূর্ত্ততা, কুকুরের যে প্রভুভক্তি, উষ্ট্রের যে কষ্টসহিষ্ণুতা, বানরের যে চাতুরি, সকলি মানববুদ্ধির আয়ত্ত। মানবকণ্ঠ সমুদয় জীবেরই ধ্বনির অনুকরণ করিতে পারে—মানবের গতি শক্তিও সর্ব্বজীবের গতিশক্তির সমষ্টি। মানবই সৃষ্টির শেষ বিকাশ। মানবদেহে আসিয়াই বৃক্ষ লতা ধাতু প্রভৃতি জড়রাজ্য ও পশ্বাদি চেতনরাজ্য লয় পাইয়া মানবেরই সম্বর্দ্ধনা করে। সুতরাং মনুষ্য যে শেষসৃষ্টি একথা বুঝাইবার বিশেষ আবশ্যক করে না। সমুদয় সৃষ্টির প্রভু করিয়াই বিধাতা মনুষ্যকে এখানে পাঠাইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রেও বলে, যে আশীলক্ষ যোনি গত হইলে পর মনুষ্য জন্ম লাভ হয়। হিন্দু শাস্ত্রের মৎস্যযুগ, বরাহযুগ প্রভৃতি কল্পনাও এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনেক পোষকতা করে। হিন্দুর মতে সৃষ্টি যে কত কালের তাহার সংখ্যা করা যায় না। প্রথমে জলের সৃষ্টি হয়। সমুদয় জগৎ জলময় থাকে। পরে কল্পান্তকাল ধরিয়া সেই জল হইতে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি

সমুদয় পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর এক এক স্তর পরীক্ষা করিলে জানা যায়, যে এই সৃষ্টি এক দিনে বা দুই দিনে সম্পাদিত হয় নাই। বহু যুগান্তর ধরিয়া এই সৃষ্টি ক্রমশই বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে।

আদিম জন্তুবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেচনা করিলে আমরাই ভূমণ্ডলের শেষ ও সর্ব্ব প্রধান অধিবাসী বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত মনুষ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীব ভূমণ্ডলে আগমন করে নাই, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। আদিম অবস্থাতে ম্যামথ অর্থাৎ কেশরযুক্ত হস্তী, বৃহৎ বৃহৎ সর্প, ও অন্যান্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জীব সকল এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল। ঐ সকল জন্তু এক্ষণে পৃথিবী হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে। মনুষ্যের আদিম অবস্থায় পৃথিবীতে এই সকল পশুরই রাজত্ব ছিল। মনুষ্য ইহাদের ভয়ে সদা সশঙ্কিত হইয়া গিরিগুহামধ্যে বাস করিত। মনুষ্যকে একেবারে নিঃসহায় করিয়া প্রকৃতি পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। মনুষ্য কেবল নিজ বুদ্ধিবলেই ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রাজত্ব লাভ করিয়াছে। বোধ হয় মনুষ্য সৃষ্ট হইয়া প্রথমে আহার অন্বেষণ করিতে সমুদয় সময় ব্যয় করিত। ক্ষুধাতুর হইলে যে পর্য্যন্ত ক্ষুধা শান্তি না হয়, ততক্ষণ কোন কার্য্য ভাল লাগে না। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যের আহারের সংস্থান করাই প্রধান কার্য্য ছিল। মনুষ্য যতই কেন অনভিজ্ঞ হউক না, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির অঙ্কুর সর্ব্বকালেই ছিল। প্রকৃতি তাহার অন্তঃকরণে যে প্রখর বুদ্ধিবৃত্তির বীজ বপন করিয়া দিয়াছেন, সেই বুদ্ধি বলেই সে সমুদয় অজ্ঞাত বিষয় উদ্ভাবন করিতে চিরদিনই সক্ষম। প্রথমতঃ মনুষ্য লোষ্ট্রাদি নিক্ষেপ দ্বারা পশু হনন করিত। কিন্তু যখন দেখিল, তদ্দ্বারা প্রকৃষ্ট রূপে পশ্বাদি হনন করা যায় না, তখন স্বকীয় বুদ্ধি প্রভাবে ধনুঃশরের সৃষ্টি করিল। মনুষ্যের আদিম অবস্থার যদিও কোন লিখিত বৃত্তান্ত নাই, তথাপি পুরাকালিক মনুষ্যের যে সকল চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা তাহাদের আহার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বর্ত্তমানকালে অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সেই তমসাবৃত কালের অনেক বিষয় আলোকে আনিয়াছেন। অতি পূর্ব্বকালে মানবজাতি বাটী নির্ম্মাণ কৌশল অবগত ছিল না। আত্মরক্ষার উপায়ান্তর না থাকায়, তাহারা গিরিগুহায় বাস করিত। ক্রমে পর্ব্বতাবৃত স্থান সকল তাহারা অধিকার করিয়া-

ছিল ও সুবিধামত বিল ও হ্রদে দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিত। ইউরোপ খণ্ডে গিরি-গুহা প্রভৃতি পূর্ব্বকালিক মনুষ্যের বাসস্থানে ও সমাধি-মন্দিরে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও তৈজসাদি পাওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা পণ্ডিতেরা আদিম মনুষ্যের পুরাবৃত্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। প্রথম প্রস্তর-কাল ও দ্বিতীয় ধাতুকাল। প্রথম কালের যে সকল অস্ত্র ও তৈজসাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সে সমুদয় প্রস্তরনির্ম্মিত। কোন কোন অস্ত্র পশ্বাদির অস্থি বা শৃঙ্গে নির্ম্মিত। পর পরকালে মনুষ্যের বাস স্থানে শিকারোপযোগী অনেক অস্ত্র ও পিত্তলনির্ম্মিত তৈজসাদি দেখা যায় বটে, কিন্তু লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র সর্ব্ব শেষে দেখিতে পাওয়া যায়। লৌহ আবিষ্কারের পর হইতেই মনুষ্য কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে শিখিয়াছে। এইরূপে ক্রমে অভাব জ্ঞান ও তৎপূরণার্থ বুদ্ধি বৃত্তি পরিচালনই সভ্যতা বৃদ্ধির নিদান।

মনুষ্য জাতির অবয়ব, বর্ণ, ও ভাষাভেদ দেখিয়া বলিতে পারা যায়, তিনটী বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ক্রমবিকাশের ফলে আদিম মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই তিন শ্রেণীকে ককেশীয়, মঙ্গোলীয় ও নিগ্রো নামে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অভিহিত করিয়াছেন।

এই আদিম মনুষ্য মধ্যে ভাষার সৃষ্টি যে কিরূপে হইল, তাহা নির্ণয় করা অথবা তাহারা কিরূপ ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিত, তাহা জানিতে পারা অতি সুকঠিন। আদিম মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করুক বা নাই করুক, স্ত্রী পুরুষে এক সঙ্গে থাকিতে হইলেও ভাষার প্রয়োজন। এ কারণ অনেকে অনুমান করেন, প্রথমতঃ ভাষা ঈঙ্গিতাত্মক ছিল। কাল সহকারে মনো-বৃত্তির পরিচালনে উহা বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। এই ভাষা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তদ্বিষয়ে তিনটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ভাষা অপৌরুষের অর্থাৎ ভাষা সৃষ্টিতে মনুষ্যের কোন হস্ত নাই, উহা ঈশ্বর-প্রদত্ত। তাঁহারা বলেন, যখন ভাষাব্যতীত মনের কোন চিন্তা অগ্রসর হয় না, তখন মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর কেহ কেহ বলেন, যে দশ জনে একত্র হইয়া যাহাকে যে নাম দিয়াছে, সেই নাম বরাবর চলিয়া আসিতেছে এবং এইরূপে ভাষা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এই মত অবৈজ্ঞানিক। কেননা, প্রথমে যাহারা একত্র হইয়া দ্রব্যাদির নামকরণ করিয়াছিল,

তাহারা তো কথা কহিয়া তবে ঐরূপ নামকরণ করিবে। সুতরাং ইহাদের মতে ভাষা না থাকিলে ভাষার সৃষ্টি হইতে পারে না। এ কারণ ঐ সকল মতের প্রতি আস্থা না করিয়া এক্ষণে ভাষা উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত মত, তাহা বলা যাইতেছে। ভাষা অনুকৃতি মূলক। প্রাকৃতিক অনেক বস্তুর দ্বারা এক একটা শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সকল শব্দের অনুকরণে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। নদী, কল কল রবে প্রবাহিত হইতেছে, মেঘ, গর গর শব্দে গর্জ্জন করিতেছে. কাক, কা কা রব করিতেছে, বিড়াল, মিউ মিউ করিতেছে—ইত্যাদি নানা প্রকার শব্দের অনুকরণ করিয়া মনুষ্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছে। ভাষা সকল আলোচনা দ্বারা জানিতে পারা যায়, যে পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষা আছে, তাহা তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। এক জাতীয় ভাষার ধাতুর সঙ্গে যোগমাত্র দ্বারা বাক্যের গঠন হয়। কোন ধাতুর কোন প্রকার রূপান্তর হয় না। এই সকল ভাষার বিভক্তি নাই। ইহাদিগকে "সংযোগ অসাপেক্ষ" ভাষা বলে। চীন, শ্যাম, আনাম বা ব্রহ্ম দেশীয় ভাষা এইরূপ। ইহা মঙ্গোলীয়দিগের ভাষা। তুরানীয় শ্রেণী নামে অভিহিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষাতেও বিভক্তি নাই, কিন্তু উহা উপসর্গ ও প্রত্যয়াদি ধাতু দ্বারা রূপান্তরিত হয়। এই ভাষার ধাতুতে ধাতুতে বা ধাতু ও সর্ব্বনামে এক প্রকার যোগ হয়। এই সকল ভাষাকে "সংযোগ সাপেক্ষ" ভাষা বলে। তামিল ভাষা, তাতার ভাষা এবং আমেরিকার আদিম জাতীয় ভাষা এইরূপ। ইহার নাম নিগ্রিটো বা দ্রাবিড় শ্রেণীয়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাষাতেই প্রকৃষ্ট রূপে বিভক্তি আছে, সংযোগ কালে ধাতুর ও সর্ব্বনামের রূপান্তর ঘটে। ইহাদিগকে বিভক্তিসম্পন্ন ভাষা বলে। পৃথিবীর যত শ্রেষ্ঠ ভাষা, সকলই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার নাম ককেসিও বা আর্য্যভাষা। ভূমণ্ডলের যাবৎ মনুষ্য কায়িক ও বাচিক ভেদে পূর্ব্বোক্ত তিন স্বাভাবিক জাতিতে বিভক্ত। আরবী, য়িহুদী, গ্রীক্, লাটিন, ইংরাজি, ফরাশি, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষা সকল এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। ধাতু, বিভক্তি চিহ্ন ও সর্ব্বনাম লইয়া এই সকল ভাষা গঠিত হইয়াছে এবং এই সকল ভাষা দেশ ভেদে ও জাতি ভেদে বাহ্যতঃ পার্থক্য প্রতীত হইলেও অথবা ইহারা সহস্র সহস্র প্রকারে বিভক্ত হইলেও ইহাদের মূল যে এক, তাহা এক্ষণে

ভাষা বিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই তৃতীয় শ্রেণীর ভাষা গুলির মধ্যে অনেক গুলি প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাতেই ভাষার মূলগত ধাতু, বিভক্তি চিহ্ন ও সর্ব্বনাম এক। সুতরাং এই সকল ভাষা যে একটী প্রাচীন মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ভারতবর্ষের সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা, বাঙ্গালা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত মূলক আধুনিক ভাষা, আধুনিক ও প্রাচীন পারসীকদিগের ভাষা, গ্রীক্ ও লাটিন ভাষা, এবং এই দুই ভাষা হইতে ফরাশীয়, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি যে সকল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে; জার্ম্মানি, ওলন্দাজী, ইংরাজি, দিনেমারি, সুইডেনি, নরওয়ে এবং রুস্ প্রভৃতি ভাষা সকলই সেই এক প্রাচীন আর্য্য ভাষা হইতে উৎপন্ন। যে জাতি ঐ প্রাচীন ভাষা ব্যবহার করিতেন, ভাষাবিজ্ঞান দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে তাঁহারাই আর্য্য জাতি। এবং আর্য্যজাতীয় ভাষা সমুৎপন্ন অপরাপর ভাষা গুলি আর্য্য-ভাষা বলিয়া কথিত হয়। যে সকল জাতির ভাষা আর্য্যভাষা তাহারা আর্য্য বংশীয় বলিয়া অনুমিত ও বর্ণিত হইয়া থাকে। যাহারা আর্য্যবংশ সম্ভূত নহে, তাহারা অনার্য্য জাতি।

এক্ষণে কথা এই যে প্রাচীন আর্য্য জাতি যাঁহারা পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ জাতির এবং আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ, তাঁহারা কোথায় বাস করিতেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে যাঁহারা আর্য্য ভাষা সকলের বিশেষ সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত এই, যে আর্য্যেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। অন্যত্র হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। তাঁহারা যখন আসেন, তখন ভারতবর্ষে অনার্য্য জাতির বাস ছিল। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে জয় করিয়া বশীভূত অথবা বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, যে হিন্দুকুশ পর্ব্বত-মালার উত্তরে আসিয়ার মধ্য-ভাগে প্রাচীন আর্য্যভূমি ছিল, সেই স্থান হইতে তাঁহারা দলে দলে বাহির হইয়া দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। কোন দল প্রাচীন গ্রীস্ দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া কাল ক্রমে শিল্প ও সাহিত্যাদি সম্বন্ধে অতুলনীয় হইয়া জগৎবিখ্যাত হইয়াছিলেন। আর এক দল রোম রাজ্য সংস্থাপন করতঃ এককালে পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অপর এক দল ইংলণ্ড ও

জর্ম্মনিতে প্রবেশ করিয়া সভ্য জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন এবং এক দল ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া জ্ঞানের অনন্ত মহিমা সংস্থাপন করিয়াছেন।

যে সকল আর্য্য ভারতবর্ষাভিমুখে প্রয়াণ করেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহারা সপ্তসিন্ধু শোভিত পঞ্জাব প্রদেশে আসিয়া বসবাস করেন। অতঃপর তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তে, তার পর ব্রহ্মর্ষি দেশে, তৎপরে মধ্যদেশে এবং সর্ব্বশেষে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী হইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের সামাজিক অবস্থান, গার্হস্থ্য-প্রণালী. কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি এক্ষণকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আর্য্যগণ যখন পঞ্জাব প্রদেশের স্বরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদী তীরে প্রথমে আবাস ভূমি মনোনীত করিয়া বসবাস করিতে থাকেন, তখন ঐ দেশের আদিম নিবাসী অনার্য্যগণের সহিত তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। অনার্য্যগণ সেই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত গুহায় বা অরণ্যে গমন করিয়া বসবাস করিতে থাকে এবং আর্য্যগণের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া তাঁহাদের দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে থাকে। ঋগ্বেদের নানা স্থানে এই কৃষ্ণবর্ণ দস্যুগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, তাহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিবার মানসে প্রাচীন আর্য্যগণ দেবতার নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছেন। অনার্য্যগণকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া যে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ ঋগ্বেদে আছে। ঋগ্বেদের রচনাকালে অর্থাৎ তাঁহাদের ভারতে বসবাস কালে যে তাঁহারা সিন্ধু নদী শোভিত ভূভাগে বাস করিয়াছিলেন, তাহারও বিস্তর প্রমাণ ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু নদী এবং ইহার পঞ্চ-শাখা ও সরস্বতী এই সকল নদীর কথাই বেদে বারম্বার উক্ত হইয়াছে—দুই এক স্থানে মাত্র গঙ্গা ও যমুনার উল্লেখ আছে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন পার্শ্ববর্ত্তী অনার্য্য জাতিগণের ন্যায় তাঁহারা অসভ্য ছিলেন না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অনার্য্যগণের ভাষা আর্য্যগণের ভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অনার্য্যগণের ভাষাকে পশুরব বলিয়াও বেদে বর্ণিত আছে। শুদ্ধ ভাষা বিষয়ে যে তাঁহারা অনার্য্যগণের সহিত

পৃথক্ ছিলেন তাহা নহে। তাঁহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমাজ সংস্থান গার্হস্থ্যাদি অনার্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। আর্য্যগণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; বস্ত্রবয়ন প্রথা অবগত থাকাতে উত্তমোত্তম পট্ট বস্ত্র পরিধান করিয়া জনসমাজে বিচরণ করিতেন; গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল অবগত থাকাতে প্রশস্ত প্রশস্ত পর্ণ গৃহ এমন কি অট্টালিকা সকলও নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বসতি করিতেন; লৌহাদি ধাতু সকলের ব্যবহার জ্ঞাত থাকায় তাঁহারা প্রয়োজনোপযোগী সমুদয় অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিতেন। স্বর্গে ও নরকে এবং আলোকে ও অন্ধকারে যেরূপ প্রভেদ, আর্য্য ও অনার্য্যে সেইরূপ প্রভেদ ছিল। শুদ্ধ যে প্রাচীন আর্য্যগণ তদানীন্তন অনার্য্যজাতি-গণের অপেক্ষা সভ্য ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের সেই সভ্যতালোক পারম্পর্য্যক্রমাগত হইয়া অদ্যাপিও আমাদিগকে আলোকিত করিতেছে। আমাদের মধ্যে ইদানীন্তন যেরূপ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, যেরূপ অতিথিসেবা, গোসেবা, দায় ভাগ, অঙ্ক, জ্যোতিষ, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ঈশ্বরোপাসনা, সম্বন্ধনির্ণয়, দশবিধ সংস্কার, রাজনীতি, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও অনুষ্ঠানাদি প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই সেই প্রাচীন আর্য্যগণের অনুকরণে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিবাহ স্থলে দম্পতি যুগল মধ্যে পরস্পর প্রতিজ্ঞা বদ্ধ রাখিবার জন্য সেই গণনাতীত কালের যে সকল বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, আমাদের বিবাহ পদ্ধতিতে সেই সকল মন্ত্র ও অনুষ্ঠান আজও প্রচলিত রহিয়াছে। তাঁহারা যেরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন, আজও আমরা তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকি। স্নান, দন্ত ধাবন, অন্ন গ্রহণ, শয়ন, উপনয়ন, গর্ভাধান, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রভৃতি সমুদয় সৎকর্ম্মে আমরা আজও মন্ত্রগত এবং অনুষ্ঠানগত তাঁহাদেরই অনুকরণ করিয়া থাকি। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা প্রবল ছিল, কিন্তু বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। দেশ বিদেশে সমুদ্র পারে বাণিজ্য প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু খাদ্যাখাদ্যের এত বিচার ছিল না। বর্ত্তমান দেব দেবী পূজাও প্রচলিত ছিল না; তখন সকলেই সরলচেতা ছিল—যুদ্ধাদিতে সকলেরই সহানুভূতি হইত—তখন কেবল ক্ষত্রিয়গণের স্কন্ধে যুদ্ধ ভার অর্পিত হয় নাই। তৎকালে যাঁহাদিগকে ঋষি বলা যাইত, তাঁহারাও যুদ্ধাদি কার্য্যে ব্যাপৃত

থাকিতেন। আজ কাল আমরা ঋষি শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রাচীন বৈদিক কালে ঋষি শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হইত না। আমরা ঋষি শব্দে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ ধ্যানধারণাপরায়ণ যোগরত অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী অলৌকিক পুরুষ মনে করি। কিন্তু বেদে যাঁহাদিগকে ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন। তাঁহারা পশ্বাদি পালন, ক্ষেত্রকর্ষণ এবং যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং ঈশ্বরের নিকট ধন ধান্য পশু ও জয় লাভ প্রভৃতির জন্য প্রার্থনা করিতেন। তৎকালে এক এক পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষই ঋষি নামে অভিহিত হইতেন।

আজ কাল ভারতবাসী আর্য্যগণ নানা বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন সিন্ধুতীরে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। ঋক্ বেদের ন্যায় প্রাচীনতম গ্রন্থ আর পৃথিবীতে নাই। উহাই আর্য্যগণের আদি পুস্তক। উহাতে দশ সহস্র ঋক্ আছে। সেই সকল ঋক্ পাঠ করিলে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, যুদ্ধ, বিবাহ, যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত সমুদয় ব্যাপারই ঐ সকল ঋকে লিখিত আছে। কিন্তু উহার কুত্রাপিও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি ভেদে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই। যদি তৎকালে বর্ণ ভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আর্য্য সমাজের এমন একটী গুরুতর প্রথা কি সমুদয় বেদে উল্লিখিত হইত না? ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী অপরাপর যে কোন গ্রন্থই পাঠ কর, গ্রন্থ বৃহৎই হউক, আর ক্ষুদ্রই হউক, কিছু না কিছু পরিমাণে তাহাতে বর্ণ ভেদের উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু ঋগ্বেদের ন্যায় অতি সুবৃহৎ বিশেষতঃ আদিম পুস্তকে যে বর্ণভেদ প্রথার উল্লেখ নাই—তৎকালে যে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বৃত্তিগত জাতিভেদ বর্ণ ভেদের নিদান। ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সে বর্ণ শব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণ্য বুঝায় না—সেখানে বর্ণ শব্দে রঙ্ বুঝায়—তাহাতে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য ও গৌরবর্ণ আর্য্যকে বুঝায়। আর্য্যদিগের উজ্জ্বলবর্ণ রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা

করিতে দেখা যায়। ঋগ্বেদে ক্ষত্রিয় শব্দের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহাতে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয় বুঝায় না—ক্ষত্রিয় শব্দে বলবান বুঝায় ও উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ঋগ্বেদে বিপ্র শব্দের যাহা উল্লেখ আছে, তাহা ব্রাহ্মণ বর্ণকে বুঝায় না—তাহা জ্ঞানীকে বুঝায় এবং উহা দেবতার্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এমন কি ঋগ্বেদে যে ব্রাহ্মণ শব্দের উল্লেখ আছে, উহা বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে বুঝায় না। পরন্তু যাঁহারা মন্ত্র রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিত। ঋগ্বেদের সময়ে পৌরোহিত্য ক্রিয়ার জন্য একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রয়োজন ছিল না। অথবা দেব দেবীর উপাসনা জন্য মন্দির বা স্বতন্ত্র গৃহের ব্যবস্থা ছিল না। গৃহপতিগণ স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্ব স্ব গৃহে উপাসনা করিতেন। তখন সকলেই বেদ উচ্চারণ করিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বেদ মন্ত্র দ্বারা স্ব স্ব ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিত। ঋগ্বেদের সময় আর্য্যগণের সহিত অনার্য্যগণের অনবরত যুদ্ধ বিগ্রহ হইত। কিন্তু তৎকালে যদি পরবর্ত্তী কালের ন্যায় চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়গণ ঐ যুদ্ধ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এরূপ লেখা থাকিত। কিন্তু ঋগ্বেদের কুত্রাপিও এরূপ বিবরণ নাই। তখন সমুদয় সমাজই একতাবদ্ধ ছিল। বৃত্তিভেদে বর্ণভেদ ছিল না। ঋক্‌বেদে দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তিকালে যে সকল আর্য্য কৃষি ও গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাই আবার অনার্য্যগণের উপদ্রব হইতে গ্রাম বা নগর রক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

সমগ্র ঋক্‌বেদের মধ্যে আমরা দশম মণ্ডলের একটী ঋকে কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাই। কিন্তু ইদানীন্তন কালের বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলটী আধুনিক। দয়ানন্দ সরস্বতী কহেন,—সেই ঋক্ একটী রূপক মাত্র। ঋক্‌বেদের সময় অর্থাৎ আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনকালের ইতিবৃত্তে যে চাতুর্ব্বর্ণের ব্যবস্থা ছিল না, তাহা মহাভারতাদি গ্রন্থ সকল পর্য্যালোচনা করিলেও জানা যায়। মহাভারতের এক স্থানে আছে,—যে আদিমকালে সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মণময় ছিল। কাল ক্রমে তাহাদের মধ্যে আচার ও বৃত্তির প্রভেদ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমুদয় লোক এক বর্ণ ও

ব্রাহ্মণ ছিল, মনুর অগ্রজন্মা বাক্যেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনু অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণগণকে অগ্রজন্মা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল; ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়গণ জন্ম গ্রহণ করেন এবং তদনন্তর চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্য যে এক দিনে সৃষ্টি হয় নাই, কালে কালে গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে ইহা প্রচলিত হইয়াছে, শাস্ত্র সকল পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। ঋক্‌বেদের সময়ে বর্ণভেদ ছিল না—ঋক্‌বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ সকল আলোচনা করিলে যদিও বর্ণভেদের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তথাপি তাহাতে বর্ত্তমান কালের ন্যায় বর্ণভেদের কঠোরতা দেখা যায় না। এক্ষণে যেমন যে শূদ্র আছে, সে আজন্ম শূদ্র থাকিবে, যিনি ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি গুণহীন হইলেও আজন্ম ব্রাহ্মণ থাকিবেন—এক্ষণকারকালে যেমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিবেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরের অন্ন ভোজন করিবেন না প্রভৃতি প্রতি কর্ম্মে লোকে বর্ণ বিচার করে, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। এক্ষণকারকালে বর্ণভেদ বংশগত, বৃত্তিগত বা গুণগত নহে। প্রাচীন শাস্ত্র সকল আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে এক পিতার চারি পুত্রের মধ্যে কেহবা ব্রাহ্মণ, কেহবা ক্ষত্রিয়, কেহবা বৈশ্য ও কেহবা শূদ্র ছিলেন। সকলেই জানেন, বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে জ্ঞানের বাহুল্য দ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ক) ক্ষত্রিয় যে অপ্রতিরথ, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি, এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (খ) ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রয়ু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মৈত্রায়ণ এবং সোম। তদ্বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হয়েন। বিশেষতঃ এক এক বংশে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

(ক) অপ্রতিরথাৎ কণ্ব স্তস্যাপি মেধাতিথি র্যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ ॥

বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়।

(খ) দিবোদাসস্য দায়াদো ব্রহ্মর্ষি মিত্রয়ুর্নৃপঃ।

মৈত্রায়ণ স্ততঃ সোমো মৈত্রেয়াস্তু ততঃ স্মৃতাঃ।

মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়,

বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (গ) মনু বৈবস্বতের পুত্র করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হইলেন। মনু বৈবস্বতের পুত্র নেদিষ্ঠ। কিন্তু নেদিষ্ঠের পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন। মনু বৈবস্বতের পুত্র পৃষধ্র গুরুর এক গাভিকে হনন করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

মহাভারতীয় হরিবংশে আছে, (ঘ) নাভাগারিষ্ঠের যে দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা আবার ব্রাহ্মণ হইলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ঙ) সুনহোত্রের তিন পুত্র—কাশ, লেশ এবং গৃৎসমদ; গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, এই শৌনকের বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়। বায়ু পুরাণেও আছে, (চ) গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক; তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, (ছ) ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি। এই ভার্গভূমি হইতে

(গ) করুষাৎ কারুষামহাবলাঃ ক্ষত্রিয়া বভূবুঃ।
নাভাগোনেদিষ্ঠ পুত্রস্তু বৈশ্যতামগমৎ।
পৃষধ্রস্তু গুরুগোবধাৎ শূদ্রত্বমগমৎ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ১ অধ্যায়।

(ঘ) নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ॥
মহাভারতীয় হরিবংশ। ১১ অধ্যায়।

(ঙ) কাশ লেশ গৃৎসমদাস্ত্রয়োঽস্যা ভবন্।
গৃৎসমদস্য শৌনক শ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতা॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

(চ) পুত্রো গৃৎসমদস্য শুনকো যস্য শৌনকঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তথৈবচ॥
এতস্যবংশে সমুদ্ভূতা বিচিত্রৈঃ কর্ম্মভির্দ্বিজাঃ॥
বায়ুপুরাণ।

(ছ) ধৃষ্টকেতুস্ততশ্চ বৈণুহোত্র স্ততশ্চভার্গঃ।
ভার্গস্য ভার্গভূমি স্ততশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবৃত্তিঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ৪ অংশ। ৮ অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণেরই উদ্ভব হয়। মহাভারতীয় হরিবংশে আছে ;—(ক) বৎস হইতে বৎস ভূমি এবং ভার্গব হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ভার্গবংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্র সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হয়েন। শাস্ত্রে যেমন ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বিভিন্ন বর্ণের চারিটী পুত্র জন্মিবার কথা লেখা আছে, তদ্রূপ অপরাপর ব্রাহ্মণ বংশ হইতেও যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ভিন্ন গুণকর্ম্মানুসারে উৎপন্ন হইয়াছে, এরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে আছে,—কৃত যুগে বর্ণভেদ ছিল না ; পরে লোকের কর্ম্মানুসারে ব্রহ্মা বর্ণভেদ ব্যবস্থা করিলেন। মনুষ্যের মধ্যে যাহাদিগকে তিনি প্রভু শক্তি এবং বীরত্ব সম্পন্ন দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ক্ষত্রিয় করিলেন। যাহাদিগকে সত্যবাদী, ঈশ্বর-পরায়ন এবং জ্ঞান প্রচারে উৎসুক দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি ব্রাহ্মণ করিলেন। যাহাদিগকে তিনি সাংসারিক, কার্য্যপটু, পরিশ্রমী এবং কৃষিজীবী দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য করিলেন এবং যাহাদিগকে তিনি নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত, মল পরিষ্কারক প্রভৃতি দেখিলেন, তাহাদিগকে তিনি শূদ্র করিলেন। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে আছে, যে সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণই ছিলেন, পরে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হয়। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে আছে, রক্তবর্ণ গৌরাঙ্গ দ্বিজগণ যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখে আসক্ত, উগ্র ও ক্রোধন স্বভাব এবং যাগ যজ্ঞ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন, পীতবর্ণ দ্বিজ সকল যাঁহারা গো ও কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্ম ও ক্রিয়া কলাপ বর্জ্জিত হইলেন, তাঁহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং কৃষ্ণবর্ণ দ্বিজ সকল যাঁহারা মিথ্যাপ্রিয়, অত্যাচার রত, সংসারাসক্ত ও নীচ কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহক্ষম, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

(ক) বৎসস্য বৎসভূমিস্তু ভার্গভূমিস্তু ভার্গবাৎ।
এতেত্বঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ জাতাবংশেহথ ভার্গবে।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ভরতর্ষভ॥
মহাভারতীয় হরিবংশ। ৩২ অধ্যায়।

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতঃ॥
কামভোগপ্রিয়া স্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃত ক্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

মহাভারতীয় মোক্ষ ধর্ম্ম।

পূর্ব্বে প্রয়োজন ও ক্ষমতানুসারে এক বর্ণের প্রতি অন্য বর্ণের বৃত্তি এবং ব্যবহার করিতে বিশেষ নিষেধও ছিল না। মনুতে আছে;—

অজীবংস্তু যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মেণ সহ্যস্য প্রত্যনন্তরঃ॥

স্বকীয় বৃত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ যদি জীবিকা অর্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিবেন। যেহেতু এই তাঁহার নিকটবর্ত্তী বৃত্তি।

উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্‌ভবেৎ।
কৃষি গো রক্ষমাস্থায় জীবেৎ বৈশ্যস্য জীবিকাং॥

স্বীয় বৃত্তি এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি উভয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন না হইলে কৃষি, গো রক্ষা প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন।

"বৈশ্যোজীবন্ স্বধর্ম্মেণ শূদ্র বৃত্ত্যাপি বর্ত্তয়েৎ॥"

বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জনে অশক্ত হইলে শূদ্র বৃত্তি করিবেন। এবং উপায় হীন স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার পালনে অক্ষম শূদ্রেরও দ্বিজ শুশ্রূষাতে জীবিকা নির্ব্বাহ না হইলে, শিল্প কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নিষ্পন্ন করিবেন। মনু বলেন;—

"যথাযথা হি সদ্‌বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনুসূয়কঃ।
তথা তথেমঙ্কামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥"

অনুসূয়ক শূদ্রও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণের আচার অনুষ্ঠান করিলে ইহলোকে যশ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ করেন।

আজকাল যেমন গুণ থাকুক বা নাই থাকুক, কর্ম্মবান্ হউক বা নাই হউক, ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইবেক, অথবা ক্ষত্রিয়াদির বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ক্ষত্রিয়াদি হইবেক, পুরাকালে বর্ণভেদের এতদূর কঠোরতা ছিল না। তৎকালে কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণের উন্নতি ও অধোগতি ছিল। ব্রাহ্মণ কর্ম্মদোষে শূদ্র হইত এবং শূদ্রও কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উন্নীত হইত। মনুতে আছে :—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাত মে বন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যত্তথৈবচ॥"

কর্ম্মানুসারে শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হয়েন এবং ব্রাহ্মণও কর্ম্মানুসারে শূদ্র হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে।

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে আছে :—

"এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈ স্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্‌ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগম সম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোহপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্ব্ব সঙ্কর ভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রোভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভি শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোহপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং॥
স্বভাবং কর্ম্মচ শুভং যত্র শূদ্রেহপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতে র্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥

ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেবতু কারণং ॥
সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তেস্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণিঃ সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি সদ্বিজঃ ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা-শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা-শূদ্রত্ব মাপ্নুতে ॥”

শূদ্র এই সকল শুভ কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্র আগমসম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। যে সর্ব্বসঙ্করভোজনকারী ব্রাহ্মণ অসচ্চরিত্র হয়েন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। কর্ম্ম দ্বারা জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত শূদ্রসন্তান শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয়, এই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভকর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাববিশিষ্ট হয়েন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ, ইহা আমার অভিপ্রায় জানিবে। উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়। শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান, এই আমার অভিপ্রায়। অতএব নির্গুণ, নির্ম্মল ব্রহ্ম যাহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে শূদ্র হয়েন, এই গুহ্য বাক্য তোমাকে বলিলাম।

“ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যতে
জাতি পরিবৃত্তৌ ॥১॥
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যতে
জাতি পরিবৃত্তৌ ॥২॥”
(আপস্তম্ব সূত্র)

ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নিকৃষ্ট বর্ণ নিজাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং যে বর্ণে যোগ্য হইবে, সেই বর্ণে গণনীয় হইবে। তদ্রূপ অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পূর্ব্ব অর্থাৎ উত্তমবর্ণবিশিষ্ট মনুষ্য নিজাপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ণে গণনীয় হয়।

সর্ব্বাগ্রে বর্ণভেদ কেবল বংশানুযায়ী না হইয়া কেবল গুণ ও কর্ম্মানুসারে হইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আরও উদাহৃত হইতে পারে। শুক্ল যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে নানা প্রকারের বৃত্তির কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বনকারীগণ তখনও যে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয় নাই, তাহা অধ্যায়দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীত হইয়া থাকে। সূত্রধর, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, রজক, ক্ষৌরকার প্রভৃতি নানারূপ বৃত্তির কথা লেখা আছে সত্য, কিন্তু তাহারা যে স্বতন্ত্র বর্ণ ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে;—বিদেহ-রাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের বরপ্রভাবে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে;—ইলুষের পুত্র কবশকে দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ প্রভৃতি বলিয়া অপরাপর ঋষিগণ কোন যজ্ঞীয় সভা হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু কবশের সহিত দেবগণের সদ্ভাব থাকায় তিনি পুনরায় ঋষিসমাজভুক্ত হয়েন। ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সত্যকাম-জাবাল-সংবাদ আছে, তদ্দৃষ্টে বুঝা যায়, যে সত্যকাম অজ্ঞাত কুলোৎপন্ন দাসীপুত্র হইলেও গৌতম তাহার সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণ্যে দীক্ষিত করিয়া বেদের উপদেশ দিয়াছিলেন। 'শূদ্রকে বেদের উপদেশ প্রদান' এরূপ আখ্যায়িকা আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে পাইয়া থাকি।

গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষক্রমে যে বর্ণভেদ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত শ্লোক গুলিও প্রমাণস্বরূপে উদাহৃত হইতে পারে।

"সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যন্তপো ঘৃণা।

দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥"

সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা যাঁহাতে দৃষ্ট হয়, হে নাগেন্দ্র! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

"জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায় নিরতঃ শুচিঃ।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"
(মহাভারত)

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি, এবং যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধকে বশে রাখিয়াছে, তাহাকেই দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"যস্যচাত্ম সমোলোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্ব ধর্ম্মেষু চ রতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি সকল লোককে আত্মতুল্য অবলোকন করেন এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত থাকেন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

"ন হায়নৈ র্ন পলিতৈ র্ন বিত্তেন নচ বন্ধুভিঃ।
ঋষয় শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনুচানঃ সনোমহান্॥"
(মনুঃ।)

অনেক বয়স হইলে বা কেশ পক্ক হইলে বা অনেক ধন ও বন্ধু থাকিলে মহত্ত্ব হয় না। ঋষিরা এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে আমাদের মধ্যে যিনি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

"নতেন বৃদ্ধো ভবতি যে নাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈ যুবাপ্যধীয়ানস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥"

শুক্ল কেশযুক্ত মস্তক হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যুবা যদি বিদ্বান হয়েন, তাঁহাকেই দেবতারা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন।

পুরাকালে যে কেবল ব্রাহ্মণবীর্য্যে জন্মগ্রহণ করিলেই লোকে ব্রাহ্মণ বলিয়া সমাদৃত হইতেন, তাহা নহে। পরন্তু গুণানুসারে ব্রাহ্মণের আদর ছিল।

ঋক্‌বেদ সংহিতায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইটী জাতি মাত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনার্য্যের পরিচয়স্থলে তাহারা দস্যু বা দাস ইত্যাদি ঘৃণাজনক বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। দস্যু শব্দের এখন প্রচলিত অর্থ ডাকাইত—

দাসের প্রচলিত অর্থ চাকর। কিন্তু এ অর্থে দস্যু বা দাস শব্দ ঋক্‌বেদে ব্যবহৃত হয় নাই। দাসদিগের স্বতন্ত্র নগর, সুতরাং স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। তাহারা আর্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিত। তাহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আর্য্যেরা ইন্দ্রাদির পূজা করিতেন। দাস বা দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ এবং আর্য্যেরা গৌর। তাহারা বর্হিষ্মান্ অর্থাৎ যজ্ঞ করে না, আর্য্যেরা যজ্ঞ করে; তাহারা "অব্রত," অর্থাৎ তাহাদেরজীবনের কোন নির্দ্ধারিত ব্রত বা কর্ত্তব্য নাই, আর্য্যেরা "সব্রত"। তাহারা অসুর অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপভোগই তাহাদের একমাত্র পুরুষার্থ; আর্য্যেরা সুর; অনার্য্যেরা "অন্যব্রত" "অমানুষ" "অযজান" "অদেব" "মৃধ্রবাচ" অর্থাৎ কথা কহিতে জানে না, নৃশংস, ক্রূর, রাক্ষস, পিশাচ, অতএব হে ইন্দ্র! হে অগ্নি! হে বরুণ! সেই অনার্য্যগণকে নিপাতিত কর; তাহারা যেন আর্য্যগণের বশীভূত হয়; আমাদিগের বংশে যেন এমন বীর পুত্র সকল জন্মে, যাহারা ঐ সকল অনার্য্য শত্রুদিগকে ধ্বংস করে; ইত্যাদি বহুবিধ প্রার্থনা ঋক্‌বেদে বারম্বার দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ বর্ণনায় নিশ্চিত বুঝা যায়, যে আর্য্যেরা অনার্য্য হইতে ভিন্নজাতীয়, ভিন্নধর্ম্মী, ভিন্নদেশী, এবং ভিন্নভাষী ও অনার্য্যদিগের পরম শত্রু ছিলেন।

বেদের অনেক পরে মন্বাদি স্মৃতি। মনুতে প্রমাণ পাওয়া যায়, যে মনু-সংহিতা সঙ্কলনকালে আর্য্যদিগের চারি পার্শ্বে অনার্য্যেরা বসতি করিত। পৌণ্ড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চিন, কিরাত, দরদ, খস, অন্ধ্র, শবর প্রভৃতি অনেক অনার্য্য জাতির নাম মনু ও মহাভারতাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। মহাভারতের সভাপর্ব্বে এই সকল জাতি দস্যু নামে বর্ণিত হইয়াছে।

অনার্য্যেরা যে পরিশেষে আর্য্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চিত। পরাজিত হইয়াই, উহারা যে যেখানে বন্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশ পাইয়াছিল, সে সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সেই সকল প্রদেশ দুর্ভেদ্য বিধায় আর্য্যেরা সেই সকল কুদেশ অধিকারে তাদৃশ ইচ্ছুক ছিলেন না। সুতরাং সেখানে তাহারা সহজেই আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। দ্রাবিড়ের ন্যায় কোন কোন দেশ অনার্য্য-প্রধান হইলেও তাহা

আর্য্য-অধিকৃত ছিল। আর্য্যাবর্ত্তের সাধারণ লোক আর্য্য এবং দাক্ষিণাত্যের সাধারণ লোক অনার্য্য। যদিও আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্য তুল্যরূপে আর্য্যাধিকৃত দেশ, তথাপি দাক্ষিণাত্য আর্য্যজিত প্রদেশ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে আর্য্যীভূত হয় নাই। দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতিতে আর্য্যধর্ম্মের বিশেষ গৌরব ও সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চা থাকিলেও ঐ সকল আর্য্যজিত প্রদেশ এরূপ অল্প পরিমাণে আর্য্যীভূত, যে সে সকল স্থানে লোকের মাতৃভাষা আজও অনার্য্য। বাঙ্গালা দেশ অনার্য্যপ্রধান।

বাঙ্গালা দেশের উত্তর সীমায় ব্রহ্মদেশের সম্মুখে পাই, থাম্‌টি, সিংকো, মিশ্‌মি, দফ্‌লা ও পাদম্ প্রভৃতি অনেক অনার্য্যজাতি বসতি করে। আসাম প্রদেশে নাগা, কুকি, মণিপুরী, কোপেয়ী, মিকির, জয়ন্তিয়া, খসিয়া ও গারো জাতির বাস। আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্র তীরে কাছাড়ি বা বোড়ো, মেচ্ ও ধিমাল জাতি এবং বাঙ্গালার মধ্যে তাহাদের নিকট কুটুম্ব কোচ জাতির বাস। হিমালয় পর্ব্বতের ভিতরে ভোট, লেপ্‌ছা, লিম্বু, কিরান্তী বা কিরাতী জাতির বাস। বাঙ্গালার পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমায়—মগ, লুসাই, কুকি, কারেণ, তালাইন্ প্রভৃতি জাতির বাস। ত্রিপুরার ভিতরে রাজবংশী, নওয়াতিয়া প্রভৃতি জাতি আছে। বাঙ্গালার পশ্চিম দিকে কোল, সাঁওতাল, খাড়িয়া, মুণ্ড, কোড়োয়া ও ধাঙ্গড় জাতি বাস করে। সাঁওতাল, হো, ভূমিজ, মুণ্ড, বীরহোড়, কড়ুয়া, কুর, বা কুকু, খাড়িয়া ও জোয়াঙ্গ এই কয়েকটী কোল্‌বংশীয় অনার্য্য বাঙ্গালা বিভাগে বাস করে। তন্মধ্যে জুয়াঙ্গোরা উড়িষ্যায় ঢেকানাল ও কেঁওঝড় প্রদেশে বাস করে। খাড়িয়ারা সিংভূমের অতিশয় বনাকীর্ণ প্রদেশে বাস করে। বীরহোড়েরা হাজারিবাগের জঙ্গলে থাকে। কড়ুয়ারা সরগুজা, যশপুর ও পালামৌ অঞ্চলে থাকে। সাঁওতালেরা গঙ্গাতীর হইতে উড়িষ্যার বৈতরণী তীর পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল ব্যাপ্ত করিয়া বাস করে; কোথাও কম, কোথাও বেশী। যে প্রদেশ এখন সাঁওতাল পরগণা বলিয়া খ্যাত, তাহা ভিন্ন ভাগলপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, হাজারিবাগ্, মানভূম, মেদিনীপুর, সিংভূম, বালেশ্বর এই কয় জেলায় ও ময়ূরভঞ্জে সাঁওতাল দিগের বাস আছে। ভূমিজেরা কাঁসাই ও সুবর্ণরেখা নদীদ্বয়ের মধ্যে মানভূম জেলা প্রভৃতি প্রদেশে বাস করে। মুণ্ড বা মুণ্ডারীরা ছোট নাগপুর অঞ্চলে বাস করে। দিনাজপুর,

মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ঢাকা, ময়মনসিং প্রভৃতি জেলায় প্রায় এক লক্ষ কোচের বাস আছে।

বিজিত অনার্য্যজাতিগণ কালে কালে জেতৃ আর্য্যগণের সংশ্রবে আর্য্যভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, তাহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম ও ভাষা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া আর্য্যাকারে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ব্যতীত অপরাপর বৃত্তিতে যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, সমাজে তাহাদের সম্মান একেবারেই ছিল না। মনু বলেন, চিকিৎসক, দেবল ব্রাহ্মণ, মাংস বিক্রেতা, দোকানদার, ইহাদিগকে শ্রাদ্ধকার্য্যে নিমন্ত্রণ করিবে না। যাহারা গায়ক, নর্ত্তক, ধনুর্দ্ধর, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুর দমনকারী, যাহারা জ্যোতিষ গণনা দ্বারা লোকের ভাগ্যাভাগ্য নির্ণয় করে, যাহারা ব্যাধ, যাহারা স্থপতি কার্য্যে কালক্ষেপ করে, যাহারা দৌত্যকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং যাহারা মেষ-পালক ও গোপালক ইহারাও ঘৃণিত। কসাই, তৈলকার, বেশ্যা,মদ্য-বিক্রেতা—মনুর মতে ইহারা সকলেই এক শ্রেণীভুক্ত। ব্রাহ্মণ ঐ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে কোন দান গ্রহণ করিবেন না। চোরের অন্ন, গায়কের অন্ন, সূত্রধর, কুসীদজীবী, চিকিৎসক, ব্যাধ, কর্ম্মকার, নাট্যকার, স্বর্ণকার, অস্ত্র-বিক্রেতা, ডোম, রজক ও শিল্পকার ইহাদের সকলের অন্নই দূষিত। ব্রাহ্মণ ইহাদের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। কৃষি কর্ম্মের উপরও শাস্ত্রকারগণের বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কোন মতে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না। স্থূল কথা, তৎকালে সমাজের সকলেই ঘৃণিত ছিল, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সম্মানার্হ ছিলেন। এই কারণ হিন্দু সমাজে কোন কালে শিল্প বিদ্যাদির উন্নতি দেখা যায় না। অথবা ঐ সকল ব্যবসায়ে কোন লোক যে খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাও শুনা যায় না। এই কারণেই শাস্ত্রকার ইহাদিগকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। কি প্রকারে যে এই সকল সঙ্করবর্ণ উৎপন্ন হইল, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ভারতবর্ষে অধুনা লোক-সংখ্যা-গণনা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ অপেক্ষা সঙ্কর বর্ণের অস্তিত্ব অধিক। যথায় ব্রাহ্মণ এক জন, তথায় সঙ্করবর্ণের সংখ্যা সহস্র জন হইবে। কিন্তু এই সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তিসম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে হাস্যোদ্রেক হয়। ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের

সহবাসে এই সকল সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, শাস্ত্রকারগণ এরূপ বলেন। যথারীতি প্রকাশ্য বিবাহের সন্তানসন্ততিগণের সংখ্যা এত অল্প হইল এবং গুপ্ত বিবাহের সন্তানসন্ততিসংখ্যা তাহার সহস্র গুণ অধিক হইল, একথা কোন্ বিচারে গ্রহণ করা যায়? আর কি প্রকারেই বা শাস্ত্রকারগণ জানিতে পারিলেন, যে কে কাহার নিকট গুপ্তভাবে গমন করিয়া কোন্ সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন? গুপ্ত গমনের যথারীতি গণনা-পুস্তক না থাকিলে এরূপ নিঃসংশয় প্রমাণ কি প্রকারে গ্রাহ্য হইবে? গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক সম্প্রতি যে লোক সংখ্যা গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে অন্যূন ৫০০০।৬০০০ হাজার ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক দেখা যায়; ঐ সকল জাতিই বা মনুর পরে কিরূপে উদ্‌ভূত হইবে? উহারাও কি স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ব্যভি-চারে উৎপন্ন, না বৃত্তিভেদ অনুসারে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে? মনুর সময়ে আর্য্যসমাজ সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরূঢ়। তাঁহার সময়ে আর্য্যসমাজে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, গোয়ালা, তন্তুবায় প্রভৃতির অস্তিত্ব ছিল না, এমন কখনই হইতে পারে না। তবে মনু কেন উহাদিগকে উল্লেখ করিলেন না? বাঙ্গালায় এক্ষণে বৈশ্য বর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। পরন্তু প্রাচীনকালে জন সাধারণকেই বৈশ্য বলিত। সুতরাং সমুদয় বর্ণের লোকাপেক্ষা বৈশ্যবর্ণের জনসংখ্যাই অধিক। কিন্তু কিরূপে এই বর্ণ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইল? ইহারা কি সবর্ণা স্ত্রীগণকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর বর্ণের স্ত্রীতে প্রসক্ত হইয়া পরিণামে সঙ্করবর্ণে পরিণত হইয়া আপনাদের অস্তিত্ব লোপ করিল? এইরূপ আশঙ্কা সম্ভবপর নহে। পরন্তু ইহা সম্ভব হইতে পারে, যে মনুর সমকালীন বৈশ্যগণ বৃত্তিভেদে এক্ষণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতিতে পরিগণিত হইয়াছে। মনুতে কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, ও বৈদ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহাদিগকে কোন স্থলেই স্বতন্ত্র বর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। আজ কাল বর্ণভেদের যে প্রধান অঙ্গ অন্ন বিচার, মনুর সময়ে ঐ সকল বর্ণের মধ্যে অন্ন বিচারের ততটা কঠোরতা ছিল না। কেননা মনু দাস, গোপাল, নাপিত, কুল মিত্র প্রভৃতির অন্ন গ্রহণ দোষাবহ নহে বলিয়া গিয়াছেন, অথবা শূদ্রান্ন খাইলে তেজ নষ্ট হয়, গণিকার অন্ন খাইলে উভয় লোক হইতে বিচ্যুতি হয়, কুসীদজীবির অন্ন ভক্ষণ পূযভক্ষণের সমান ইত্যাদিভাবেই অন্ন বিচার করিয়া গিয়াছেন।

মনু বৈশ্যগণের কর্ম্ম-বিভাগ-স্থলে কৃষিকার্য্য, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্প প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য বলিয়া গিয়াছেন। কর্ম্মতঃ গ্রহণ করিতে গেলে তখন কৃষক, রাখাল, বণিক, দোকানদার প্রভৃতি সকলেই বৈশ্যপদবীবাচ্য ও বেদের অধিকারী ছিল। পরাশর কর্ম্মকার, পোদ্দার, ব্যবসাদার, কৃষক প্রভৃতিকে বৈশ্য বলিয়া স্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন।

বৈশ্যের শূদ্র হইবার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে তাহাদের অজ্ঞতা প্রধান। তাহারা আপন অধিকার রক্ষার জন্য কখনও প্রয়াস পায় নাই। যে সদা বিষয়কর্ম্মে রত, তাহার পক্ষে দ্বিজোচিত ক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সময় কোথায়? সুতরাং তিনি যে ক্রিয়ালোপ-প্রযুক্ত শূদ্রত্বে পতিত হইবেন, ইহা অসম্ভব নহে। এইরূপ ক্রিয়াবর্জ্জিত জাতিগুলিকে অশ্রদ্ধেয় করিবার জন্য সদাচারনিরত শাস্ত্রকারগণকে কোন উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। যাহারা শূদ্র নহে, অথচ শূদ্রের আচারধারী হইল, তাহাদের সামাজিক সম্মান খর্ব্ব করিবার জন্য ও ক্রিয়াবান্‌দিগের নিকট হেয় দেখাইতে হইবে বলিয়া সঙ্করত্বের আরোপ করিয়া দিলেন। তাহাতেও কিঞ্চিৎ উৎকর্ষাপ-কর্ষের ভাব রাখিলেন। সঙ্করত্ব কিন্তু অলীক নহে, তাহা অন্য প্রকারে সত্য। মূলে সত্য না থাকিলে ঐ তত্ত্বের এত প্রসার হইত না। অধ্যাপক ফাউলারের মতানুবর্ত্তী পাশ্চাত্য জাতিতত্ত্ববিদ্যানুসারে মানবগণ মঙ্গোলিক, ককেশীয়ান ও নিগ্রটী এই তিন প্রাকৃতিক জাতিতে বিভক্ত। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ড দেশীয় মহাপণ্ডিত এণ্ডার্স রেডজিয়স্ জাতিতত্ত্ব বিদ্যার ক্রিয়া-সিদ্ধ অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করেন। তৎপ্রদর্শিত পথের অনুসরণ করিয়া কিউভার সাহেব ভারতের অধিবাসীদিগের মুখমণ্ডল ও মস্তকের পরিমাণ করতঃ স্থির করিয়াছেন, যে তাঁহারা ককেশীয় ও নিগ্রিটো জাতির মিশ্রণ। মিশ্রণ ভারতবর্ষীয় তাবৎ জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র-নির্ব্বিশেষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর্য্যগণ শ্বেতকায় ও ককেশীয়। তাঁহারা ভারতে আগমন করিয়া তাৎকালিক অধিবাসী কৃষ্ণকায় নিগ্রিটো দ্রাবিড়গণের সহিত কিছুকাল পরে একরক্ত হইয়া এরূপভাবে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিলেন, যে পরবর্ত্তীকালে তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টিগোচর করা দুরূহ হইল। মহাভারতে লিখিত আছে :—

"জাতিরত্র মহাসর্প মনুষ্যত্বে মহামতে।
সঙ্করাৎ সর্ব্ব বর্ণানাং দুষ্পরিক্ষেতি মে মতি ॥"
(বনপর্ব্ব—১৮০ অঃ)

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যোগ্যতরের সংরক্ষণ এই দুই অনিবার্য্য হেতু বশতঃ মনুষ্যের ভিন্ন জাতির সহিত দাম্পত্য-বন্ধন সংঘটিত হয়। বর্ণসঙ্কর হইবার ইহাই কারণ। আর্য্যগণ এই কারণেই অনার্য্যগণের সহিত যৌন সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা জিত জাতিকে সমূলে নিধন করিতে পারেন, সংখ্যায় এত অধিক ছিলেন না। ক্রমে জেতা ও জিত মিলিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছেন। তবে কোন স্থানে যে অমিশ্র আর্য্যজাতি নাই, এমন বলিতে পারা যায় না। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণ বিশুদ্ধ আর্য্য শরীর রক্ষা করিতেছেন। আর্য্য ও অনার্য্যের মিশ্রণ পঞ্জাবে ঘটিয়াছিল। তথা হইতে এই মিশ্রিত জাতি অনুগাঙ্গ প্রদেশে গমন করিয়া তথাকার আদিমবাসীগণকে আপনাদের সহিত মিলাইয়া সভ্য করতঃ কাহাকে ব্রাহ্মণ, কাহাকেও বা ক্ষত্রিয় করিয়া লইলেন। যাহারা তদপেক্ষায় ক্ষমতায় হীন, তাহারা যথাসম্ভব অন্তবিধ নামে অভিহিত হইল। জেতা ও জিতের সহিত একরক্ত হইয়া যাইবার নিদর্শন পৃথিবীর অনেক স্থানে আছে। কতকগুলি আর্য্য স্বদেশ ত্যাগ করিয়া এমন স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, যথায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য আপনাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তজ্জন্যই বংশ-বৃদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়। অনার্য্যা পত্নী গ্রহণ ভিন্ন সেই অভিষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। এজন্য তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অনার্য্যের সহিত একরক্ত হইতে হইয়াছে। তাহাতে জেতা ও জিতের সহিত বৈষম্য বহুল পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

অসবর্ণ বিবাহ বিশ্বজনীন। ইহা হইতে কোন জাতি রক্ষা পাইতে পারে না। সুতরাং সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি স্বাভাবিক নিয়মের ফল। যে কারণে অসবর্ণা স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত, পৌরাণিক যুগে জন-সংখ্যার বৃদ্ধিকালে তাহা তিরোহিত হওয়ার, শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণা বিবাহ নিষেধ করেন। সঙ্কর জাতি অদ্যাপি উৎপন্ন হইতেছে। বৈদ্যনাথের পাণ্ডাগণ "কাহার" জাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহারা বাভন্ নামে একটী শ্রেণীর উৎপত্তি

করিয়াছে। ছোট নাগপুরে মুণ্ডাদিগের মধ্যে নয়টি মিশ্র জাতি আছে;—যথা—খাঙ্গার মুণ্ডা, খোবিয়া মুণ্ডা, কনকপথ মুণ্ডা, করঙ্গা মুণ্ডা, মোহিলী-মুণ্ডা, নাগবংশী মুণ্ডা, ওরাঁও মুণ্ডা, সাদমুণ্ডা এবং সবরমুণ্ডা। মুণ্ডা পুরুষ ও প্রথমোক্ত অপর জাতীয়া স্ত্রী সহযোগে এই বিভাগ গুলি জন্মে। বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক হইলেও শাস্ত্রকারগণ যে কল্পনার সাহায্যে যাহারা সঙ্কর নহে, তাহাদেরও উৎপত্তি দোষাশ্রিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ যাহাদের জাতীয় নাম ব্যবসায়বোধক হইয়া রহিয়াছে, তাহা-দের উৎপত্তি সঙ্করতায় সংঘটন বর্ণনা করা কল্পনা ভিন্ন প্রকৃত ঘটনা বলা যাইতে পারে না। আমাদের দেশের লোকের জ্ঞান এমন হীন, যে পৌরাণিক কল্পনা-প্রসূত জাতিতত্ত্ব পুস্তকের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধ সংস্করণ বটতলা হইতে বাহির হইয়া লোকের তত্ত্বানুরাগ-স্পৃহা পূরণ করিতেছে।

বাঙ্গালা দেশ কতকালের, ইহার আদিম অধিবাসী কে ছিল, এই দেশের ভাষার কি প্রকারে উৎপত্তি হইল, বাঙ্গালা দেশে এক্ষণে যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, হাড়ি, কাওরা, পোদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি বাস করিতেছে, ইহারা চিরকাল এখানে বাস করিতেছে, না কালে কালে নানা দিগ্দেশ হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে? এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এদেশ সম্বন্ধে প্রাচীনকালের কোন সুস্পষ্ট ইতিহাস নাই। বরঞ্চ ভারতবর্ষের অপরা-পর স্থানের প্রাচীন আচার ব্যবহার, রীতি নীতি সকল নানা সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পরন্তু বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালির কথা কোন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ নাই বলিলেও হয়।

যাঁহার দিগন্ত-প্রসারী কীর্ত্তি বা যশঃ ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে, এদেশে এরূপ কোন ঋষি, মুনি, কবি, দার্শনিক, বীর, যোদ্ধা বা অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন নাই। অথবা এদেশে এমন কোন পবিত্র তীর্থ নাই, যদ্দর্শন-লালসায় সুদূর দেশ সকল হইতে যাত্রীগণ এখানে আসিয়া ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবে। সত্য বটে, চৈতন্য, জয়দেব, রঘু-নন্দন, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন; পরন্তু ঐ সকল মহাত্মার আবির্ভাব বড় অধিক দিনের নয়। সুতরাং ইহাতে প্রাচীনকালের বাঙ্গালার কোন দৃশ্য

দেখা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, অতি প্রাচীনকালে এদেশ সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল। পরে গঙ্গা প্রভৃতি স্রোতস্বতী সকলের আবিলতায় কাল-ক্রমে ইহা পরিপূরিত হইয়া মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। এ দেশের ভূমি যেরূপ নিম্ন, দেশমধ্যে জলা ভূমি যেরূপ বিস্তৃত, চক্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি নামে এ দেশের বহুতর স্থানের যেরূপ প্রসিদ্ধি, এবং অপরাপর নানা কারণে ইহা যে পূর্ব্বে জলমগ্ন ছিল ও অতি প্রাচীনকালের দেশ নয়, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সৃষ্টির প্রাক্‌কালে যখন সকলই জলময় ছিল, জলই যখন আদি সৃষ্টি, তখন ভূভাগ সকল যে পরে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ঋগ্বেদে বাঙ্গালা দেশের উল্লেখ নাই, মন্বাদি স্মৃতিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ নাই, রামায়ণে ইহার নাম শুনা যায় না। প্রাচীন পুরাণের মধ্যে মহাভারতে কেবল অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। তন্ত্র ও উপপুরাণ সমূহে বাঙ্গালার ও তন্মধ্যস্থ নানা প্রদেশের অনেক উল্লেখ আছে, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রাচীন বলা যায় না। বৈদিককালে বিহারই অনার্য্য-ভূমি ছিল—বিহারীরাই কীকতদেশবাসী ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। পরন্তু বঙ্গের কোন প্রমাণই নাই। মনু আর্য্যাবর্ত্তের সীমা-নিরূপণ-স্থলে পূর্ব্ব সীমাকে সমুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—পরন্তু বঙ্গের কোন উল্লেখ করেন নাই। যাহা হউক, বঙ্গদেশ যে ভারতবর্ষের মধ্যে একটী আধুনিক প্রদেশ এবং ইহার আদিম অধিবাসীগণ যে অনার্য্য ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এদেশের ভাষা পূর্ব্বে অনার্য্যবহুলই ছিল, পরে আর্য্য দ্বিজ-গণের সমাগমে ঐ ভাষা ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান সাধুভাষায় পরিণত হইয়াছে। এদেশ প্রাচীনকালে কেন, বর্ত্তমানকালেও যে অনার্য্যবহুল, গত "সেন্‌সাস" অর্থাৎ লোক-সংখ্যা-গণনায় তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

হরিবংশে আছে, যে যযাতির কনিষ্ঠপুত্র তুর্ব্বসুর বংশে কোল নামে এক রাজা ছিলেন। উত্তর ভারতে তাঁহার রাজ্য ছিল। তাঁহারই বংশে কোল-দিগের উৎপত্তি। মনুতে "কোলিসর্প" বলিয়া একজাতির পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গ দেখা যায়। কোলেরাই যে পূর্ব্বে বাঙ্গালা ও বিহারের অনুগাঙ্গ প্রদেশের অধিবাসী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ও বিহার প্রদেশে পূর্ব্বে কোলভাষা ভিন্ন অপর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। মগধ প্রদেশে,

বিশেষতঃ সাহাবাদ জেলায় অনেক ভগ্ন মন্দির ও অট্টালিকা আছে। প্রবাদ আছে, সে সকল চেরো ও কোল জাতীয়দিগের নির্ম্মিত। কিম্বদন্তী এইরূপ, ঐ প্রদেশের সাধারণ লোক কোল এবং রাজারা চেরো ছিলেন। ঋগ্বেদ-সংহিতায় কীকত নামে এক অনার্য্য দেশের উল্লেখ আছে। অনেকে অনুমান করেন, উহার বর্ত্তমান নাম মগধ। কৈকতেরা গোপালন করিত, কিন্তু গাভী-দুগ্ধ ব্যবহার করিত না। কোলেরা অদ্যাপিও গোদুগ্ধ ব্যবহার করে না। এই কারণে বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে মগধরাজ্যে কৈকত বা কোলগণই বাস করিত।

আবার এই অনার্য্যগণের মধ্যে অনেকে অনার্য্যভাষা ও অনার্য্য ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কালক্রমে আর্য্যভাষা ও আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক হিন্দু হইয়াছে, তাহারও অনেক উদাহরণ আছে।

প্রথম। হাজারিবাগ প্রদেশে বিন্থা নামে এক জাতি বাস করে। বেদিয়া হইতে তাহারা পৃথক্। তাহারা কখন কখন বিন্থা মাহাত্ম্য নাম ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে এবং হিন্দু মধ্যে গণ্য। কিন্তু এই বিন্থাগণ যে মুণ্ডাজাতীয় কোল, তাহাতে আর সংশয় নাই। ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদিগের যেরূপ আকৃতি, ইহাদিগেরও সেইরূপ আকৃতি। মুণ্ডাদিগের মধ্যে পহন নামে এক একজন পুরোহিত বা গ্রাম্যকর্ম্মচারী দেখা যায়। বিন্থা-গণের মধ্যেও ঐরূপ গ্রামে গ্রামে পহন আছে। মুণ্ডারা লৌহ প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বিন্থাগণও লৌহ-কার্য্যে সুদক্ষ এবং লৌহ-ব্যবসায়ী। আর মুণ্ডাদিগের মধ্যে কিলী অর্থাৎ জাতি-বিভাগ আছে। ইহাদিগের মধ্যেও কিলী দৃষ্ট হয়। মুণ্ডাদিগের কিলীর যে যে নাম, বিন্থাদিগের কিলীরও সেই সেই নাম। অতএব ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, যে বিন্থাগণ মুণ্ডাকোল-বংশীয়। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দীভাষা ব্যব-হার করে ও হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে।

দ্বিতীয়। আসামে চুটিয়া নামে একটী জাতি আছে। তাহাদের মুখাবয়ব অনার্য্যের ন্যায়। লকিমপুর প্রদেশে দিক্রুনদীর উপরে এবং উপর আসামের অন্যত্র চুটীয়া নামে এক জাতি পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের ভাষা সমালোচনা করিয়া স্থির হইয়াছে, যে চুটীয়া ভাষা গারো ও বোড়োদিগের ভাষার অনু-

রূপ। অতএব চুটিয়ারা যে অনার্য্যজাতি, তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। কিন্তু এক্ষণে আসামের অধিকাংশ চুটিয়া হিন্দু বলিয়া গণ্য এবং তাহারা আপনারাও হিন্দু চুটিয়া বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। হিন্দু চুটিয়া বলিলেই বুঝাইবে, যে ম্লেচ্ছ চুটিয়া ছিল বা আছে।

তৃতীয়। কাছাড়িরা অনার্য্যবংশীয়। তাহাদের অবয়ব মঙ্গোলিয়। কিন্তু আসাম প্রদেশীয় কাছাড়িরা হিন্দু হইয়াছে এবং এক্ষণেও অনেকে হিন্দু হইতেছে।

চতুর্থ। কোচেরা আর একটী অনার্য্যজাতি। প্রকৃত কোচ্‌ভাষা মেছ্ কাছাড়ি ভাষা সদৃশ। কিন্তু ঐতিহাসিক সময়েই কোচ্‌বিহারের রাজাদিগের আদি পুরুষ হজুর পৌত্র বিসু সিং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কোচ্‌বিহারের যত ভদ্র লোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা রাজবংশী নাম গ্রহণ করিলেন ও অপর কোচেরা মুসলমান হইল।

পঞ্চম। ত্রিপুরার পাহাড়ি লোক অনার্য্যজাতি। কিন্তু তাহারাও হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

ষষ্ঠ। খাড়োয়ার নামক অনার্য্যজাতি কালীপূজা করিয়া থাকে।

সপ্তম। পালামৌতে পহেয়া নামক একজাতি আছে, তাহারা হিন্দীভাষা ব্যবহার করে এবং তাহাদের কতকগুলি আচার ব্যবহার হিন্দুদিগের ন্যায়। তাহাদেরও অনার্য্যত্ব নিঃসন্দেহ।

অষ্টম। সর্গুজায় কিলাম নামে এক জাতি আছে, তাহারাও অনার্য্য এবং তাহাদের আচার ব্যবহার অধিকাংশই কোলের ন্যায়। তাহাদেরও ভাষা হিন্দী এবং তাহারা কতক কতক হিন্দু আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে।

নবম। "বুনো" কুলি সকলেই দেখিয়াছেন। তাহারা জাতিতে সাঁওতাল, কোল বা ধাঙ্গড়। কিন্তু এদেশে যত "বুনো" দেখা যায়, সকলেই হিন্দু। বাঙ্গালার বাহিরে যেমন এই সকল অনার্য্য হিন্দু দেখা যায়, সেইরূপ বাঙ্গালার ভিতরে বাঙ্গালির মধ্যে অনেক অনার্য্য হিন্দু এখনও দেখাইতে পারা যায়। দিনাজপুর ও মালদহে পলি বা পলিয়া নামে এক জাতি আছে, তাহারা ভাষায় বাঙ্গালি ও ধর্ম্মে হিন্দু। সুতরাং তাহারা বাঙ্গালি বলিয়াই গণ্য। কিন্তু তাহাদের আচার ব্যবহার অনার্য্যের ন্যায়। তাহারা কৃষক,রা

খর্ব্বাকৃতি, শূকর পালন করে ও তাহার মাংস খায়। মনু ও মহাভারতাদির পুলিন্দ জাতি বর্ত্তমান পলিদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই দেশ যে অনার্য্যবহুল এবং অনার্য্যগণই যে এ দেশের আদিম নিবাসী, তদ্বিষয়ে বিস্তর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। এখানকার অনার্য্য জাতির মধ্যে অনেকে এক্ষণে আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে। মুসলমানগণ আদিমবাসীদিগকে আপনাদের মধ্যে একবারে গ্রহণ করেন। হিন্দুগণ একবারে না লইয়া ক্রমশঃ মিলাইয়াছেন। ছোটনাগপুরে এক্ষণেও সেইরূপ আর্য্যীকরণ চলিতেছে। কোন আদিমবাসী ভূম্যাধিকারী হইলে হিন্দু-সন্নিধানেবাস হেতু হৃদয় অনেকটা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় একজন ব্রাহ্মণকে পুরোহিতরূপে বরণ করেন। ইহাতে, তাহার স্বজাতীয়গণের সহিত সংশ্রব রহিত হইয়া যায়। তখন সে ব্যক্তি আপনাকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। ক্রমে ব্রাহ্মণগণ তাহাকে চন্দ্র বা সূর্য্য বংশীয় বলিয়া স্বীকার করেন। অনার্য্যগণ এক একটি করিয়া সমস্ত পূর্ব্ব প্রথা পরিত্যাগ করতঃ আর্য্যভাব ও আচার পরিগ্রহ করিয়া নবজীবন লাভ করিলে পর, বোধ হয় তাহারা চিরদিনই এইরূপ ছিল। বিধবা বিবাহ করিতে নাই, বাল্যে বিবাহ দিতে হইবে, পতি-পত্নীর পরিবর্জ্জন দোষাবহ হইয়া উঠে। বিষ্ণু ও শিবকে চিরকালের কুলদেবতা জ্ঞান হয়।

হিন্দুস্থানীদের মধ্যে তরুই পাঁড়ে ও মচিয়া পাঁড়ে নামধেয় ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন রাজার অধিকসংখ্যক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হওয়ায় আজ্ঞা করিয়াছিলেন, যাহাকে সম্মুখে পাও, তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া গ্রহণ করিবে। তদনুসারে শস্য-ক্ষেত্র-রক্ষাকারী মঞ্চোপরি উপবিষ্ট কৃষককে আনয়ন করিয়াছিল। সে মচিয়া পাঁড়ে নামক ব্রাহ্মণ শ্রেণীর প্রবর্ত্তক হইয়াছে।

ভিন্নবংশীয় লোক সমধর্ম্মী হইলে ভারতীয় আর্য্য বর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। হিমালয়ের উত্তরাঞ্চলনিবাসী শক জাতি ভারতের নানা স্থানে বসতি স্থাপিত করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে বর্ণভেদের উচ্চাবচ সম্মান-অবহেলাকারী সন্ন্যাসীদিগের বৌদ্ধসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া তদনন্তর বর্ণ-গৌরবাক্রান্ত ক্ষত্রিয়শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে পুতিহর, প্রমার, চালুক্য ও চৌহান উপাধিধারী রাজপুতগণ শকবংশাবতংস। কাশ্মীরের বৌদ্ধমতাবলম্বী শকরাজা কণিষ্ক কর্ত্তৃক যে অব্দ প্রচলিত হয়

তাহা আমরা শকাব্দ নামে ব্যবহার করি। চীন ও জাপানে এই অব্দ প্রচলিত আছে।

নেপালে আর্য্যীকরণে গৃহীত যে সকল মগর, ব্রাহ্মণ্য নীতির অনুগত হইয়াছিল, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যবংশ প্রভৃতি সম্মানিত মূল আশ্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদিগের দ্বারা বর্ত্তমান কালের প্রসিদ্ধ থাপা, ঘরটি ও রাণাকুল উৎপন্ন। এই নব ক্ষাত্রয়েরা খস্ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক মগর-পত্নীতে উদ্ভূত সন্তানগুলিও উপবীতধারী; অপিচ উক্ত নব ক্ষত্রিয়ের অন্তর্গত। এবংবিধ বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বংশের সংমিশ্রণে এক অভিনব ভাবের উদয় হইলে তদ্দ্বারা তাঁহাদের ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া তিব্বত ও ভারতীয় বাক্যের মিশ্রণে খস্কু নামধেয় পৃথক্ উপভাষায় পরিণত হয়।

গুরঙ্গগণ উপবীত প্রাপ্ত হয় নাই। এই কারণে সামাজিক সম্মানে তাহারা ক্ষত্রিয়ের নিম্নে ও বৈশ্যের উপরে স্থান পায়। যে সকল গুরঙ্গ হিন্দুসমাজ হইতে সুদূরে বাস করে, তাহারা অদ্যাপি ম্লেচ্ছভাব রক্ষা করিয়া বৌদ্ধমতানুবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। তথাপি খস্দিগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায়, উহাদের ব্যবহার ও বিশ্বাস ক্রমে রূপান্তরিত হইতেছে। সেইরূপ আবার বৃটিশ গুর্খা-সেনা-দলস্থ গুরঙ্গগণকে বিদেশে অবস্থানকালে হিন্দুসমাজে বাস করিতে হয় বলিয়া তাহারা তদনুযায়ী শৌচাচার ও ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। নেওয়ার জাতি ৬৯ শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে ১৬টি শাখা বুদ্ধমার্গী, ৩৮টি মধ্যপথাবলম্বী ও ১৫টি শিবমার্গা। মধ্যপথানুসরণ-কারিগণ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়বিধ পুরোহিতের দ্বারা গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করেন। নেওয়ারি বর্ণমালা স্বতন্ত্র সাহিত্যও আছে। তাহাদের শিল্পাদিতে চীন দেশীয় ভাব বিদ্যমান। (১) তাহাদিগের রাজা হিন্দু, তজ্জন্য নেপালে হিন্দুত্ব সম্মানিত। যদি হিন্দু-গৌরব-সূর্য্য অস্তমিত না হয়, তাহা হইলে তাবৎ গুরঙ্গ ও নেওয়ারেরা হিন্দু

(১) চীন অক্ষরে কোন উচ্চারণ প্রকাশ করে না। তাহা একটি ভাবব্যঞ্জক চিহ্ন। পাঠক আপন অভ্যাস অনুযায়ী এক অক্ষরে বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করেন। উক্ত বর্ণমালায় দুই সহস্রাধিক অক্ষর আছে।

হইবে, সন্দেহ নাই। নেওয়ারদিগকে পরাজিত করিয়া গুর্খারাজ নেপালকে একচ্ছত্র করিয়াছেন। কিন্তু জেতৃ-জাতি বিজিতদিগকে সেনাদলে প্রবেশ করিতে দেয়·নাই। কাজেই নেওয়ারদিগকে বাণিজ্যে নিরত থাকিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় উপাধ্যায়গণ এখন আর তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় (সামরিক জাতি) করিতে পারিবেন না। কাজে কাজেই তাহাদিগকে বৈশ্য হইতে হইবে।

মণিপুর এবং ত্রিপুরার পরম বৈষ্ণব বাঙ্গালী ক্ষত্রিয়দিগকে দর্শন করিলে, তাঁহারা শারীরিক লক্ষণানুসারে যে মঙ্গোলীয় বংশীয়, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপে 'আহম' মগগণ, রাজত্ব আরম্ভ করিয়া শাক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। মুসলমান অত্যাচারে মগ যাজকেরা চট্টগ্রাম হইতে পলায়নপর হইলে তত্রত্য মগ অধিবাসিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বনে প্রবৃত্ত হয়; এবং দুর্গা পূজা করিয়া ছাগবলি ও দেশীয় প্রাচীন দেবতার সমীপে পূর্ব্ব আচারানুসারে কুক্কুটবলিও প্রদান করে। এক্ষণে তাহারা তাহাদিগের পূর্ব্ব উপদেষ্টাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বৌদ্ধ-মতে দীক্ষিত হইতেছে। তাহাদিগের মধ্যে এক পরিবারে কালাচরণ ও বরকৃত আলি এই দ্বিবিধ নামই দৃষ্ট হয়।

বিহার হইতে আর্য্যগণ বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিলেন ইহাই সম্ভাবিত। বিহারে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মত পরবর্ত্তীকালে বহু লোকের দ্বারা গৃহীত হইলে ভারত ইতিহাসে এক নব যুগের আবির্ভাব করিয়াছিল। মগধের প্রভাব বাঙ্গালায় আর্য্যসভ্যতা বহন করিয়া আনিয়াছে। বৈদিকযুগে জাতিভেদ হয় নাই, বর্ণভেদ ছিল। তাহা কেবল শ্বেত ও কৃষ্ণে আবদ্ধ থাকায় আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই শ্রেণী ভেদ থাকে। প্রাচীন মহাভারতের যুগে জাতিভেদ হইয়াছে, কিন্তু ভেদ চিরস্থায়ী ছিল না। আর্য্যগণ অনার্য্যগণের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বর্ণভেদকে জাতিভেদে পরিণত করিলেন। জীবিকানুসারে বা গুণকর্ম্মভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রথমে এই চারিটী জাতি হয়। তাহাই চতুর্ব্বর্ণ নামে খ্যাত। অনার্য্যগণকে নিষাদ বলা হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য পৃথক্ জাতি তখন হইত না। এক বর্ণের ক্ষমতা-বিপর্য্যয় হইলে সে ব্যক্তি অন্য বর্ণে প্রবেশ লাভ করিত। আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা

শূদ্রধর্ম্মী ও অনার্য্যগণ শূদ্র নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। দার্শনিক যুগে জাতিভেদ স্থায়ী বা বংশগত হইল। নানা ব্যবসায় উৎপন্ন হইয়া পুরুষানুক্রমে জনসাধারণকে অনুগত করিয়া পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করতঃ মর্য্যাদার অতিরিক্ত তারতম্য ঘটাইল। জীবিকানুযায়ী বহু নামধারী জাতি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এক্ষণে জাতিভেদ বংশগত হওয়ায় সঙ্কর হইলে পৃথক্ নামধেয় শ্রেণী হওয়া আবশ্যক হইল, তাহাতে আবার নূতন জাতির উদ্ভব হইতে লাগিল। এমন সময় বুদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জাতিভেদের কঠোরতা ছেদন করিয়া সাম্য স্থাপন করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণগণের শঙ্কার স্থল হইলেন। জনসাধারণকে জ্ঞানী করিবার জন্য তিনি আপনার উক্তি পালি হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত করিতে শিষ্যগণকে নিষেধ করিয়া যান। তৎপ্রবর্ত্তিত পথের অনুসরণ করিয়া শিষ্যগণ বৌদ্ধযুগকে ভারতের গৌরবের সময় করিয়া তুলেন। বুদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, সামাজিক জাতিভেদ তাঁহার নিকট অনাস্থার সামগ্রী বলিয়া, গৃহী বৌদ্ধগণ জাতিভেদের বিশেষ পক্ষপাতী হয়েন নাই। বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুসরণ না করায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণের নিকট পতিত বলিয়া গণ্য হইতে লাগিলেন। বৌদ্ধদলকে পুষ্ট হইতে দেখিয়া বেদাচারীগণকে কৌশল-পরায়ণ হইতে হইল। পৌরাণিকযুগে জাতিভেদের শৈথিল্য দূর করিয়া অতি দৃঢ় করা হইল। পাণিগ্রহণ ও অন্নগ্রহণ সম্বন্ধে কঠোর নিয়ম করিয়া এক জাতির মধ্যে উপজাতিসকলের সৃজন আরম্ভ হইল। ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হইয়া আবার অতিরিক্ত জাতি গঠিত হইতে লাগিল। মঙ্গোলীয় অনার্য্যগণ এই সময় বেদাচারে রত হইয়া নূতন জাতির উদ্ভাবন করে।

বর্ত্তমান সময় পৌরাণিককালের অন্তর্গত হইলেও মুসলমান আধিপত্য হইতে বৈদেশিকদিগের সংশ্রব হওয়ায়, এক্ষণে পৌরাণিক যুগকে বৈদেশিক আধিপত্যের যুগ নামে নির্দ্দেশ করা উচিত। ৯৫০ খৃষ্টাব্দে রাজপুতদিগের অভ্যুদয়কালে বর্ত্তমান আকারের হিন্দু-ধর্ম্ম উত্থিত হইয়াছে। আদিমজাতিভেদের মূলসূত্র জীবিকা। জীবিকার উপায় বিবিধ হওয়ায় বিস্তর জাতি হইয়াছে। আদি চারিবর্ণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া ধারাবাহিকতা রক্ষা করা পৌরাণিকগণের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল। ফলতঃ জাতিভেদের ক্রমবিকাশ-পদ্ধতি-অনুসারে বহুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। সেগুলিকে

চারিটীর মধ্যে লইয়া গিয়া বিষম গোলযোগ ঘটান হইল। পরিবর্ত্তন যতই কেন হউক না, পূর্ব্বভাব একেবারে লুপ্ত হইবার নহে। জাতি-ভেদ এ দেশের ধাতুতে স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভেদ বংশগত আছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় গুণকর্ম্মানুসারে নিম্নবর্ণকে উচ্চবর্ণে প্রবেশ করিতে দেখা যায় না, এমন নহে। ভারতবর্ষ বৈদেশিক আধিপত্যে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পৌরাণিক জাতিভেদের প্রকৃত আকার স্বাধীন নেপালে প্রকৃষ্ট-রূপে বর্ত্তমানকালে দৃষ্ট হইতে পারে। ভূপঞ্জরে খনিত যুগান্তরের জীবাস্থি যেমন ইদানীং লুপ্ত জীবের পূর্ব্বতন অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়, পর্ব্বত—প্রাকার-বেষ্টিত হইয়া পৌরাণিক জাতিভেদ ও বৌদ্ধধর্ম্ম সেইরূপ "Fossil"এর আকারে প্রত্ন-তত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসু গণের জন্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। মনু-নির্দ্দিষ্ট বিবাহ-সূত্রে নেপালীরা জাতিভেদ রক্ষা করিতেছে। তাহারা মঙ্গোলীয় অনার্য্য হইলেও আর্য্যত্বের গৌরবস্বরূপ হইয়াছে। ১১০০ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানগণ ভারত স্পর্শ করেন নাই, তৎকালে বেদাচারীগণ নেপালে প্রবেশ করিয়া আর্য্যীকরণ আরম্ভ করেন।

অধুনা নেপালে ব্রাহ্মণ সবর্ণা ও ক্ষত্রিয়া; ক্ষত্রিয় সবর্ণা ও বৈশ্যা; বৈশ্য সবর্ণা ও শূদ্রা; এবং শূদ্র কেবল সবর্ণাকে বিবাহ করিতে পারে। অসবর্ণ বিবাহে কন্যার পঞ্চামৃত পান বিভিন্ন পাত্রে সম্পাদিত হয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে অন্য ব্যতিক্রম নাই। অন্নগ্রহণসম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায়, অসবর্ণ-বিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, অসবর্ণা স্ত্রীর অন্নগ্রহণ করেন না; বৈশ্য শূদ্রের পক্ষে অসবর্ণার অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ নহে। শূদ্রের অসবর্ণা স্ত্রী অর্থে শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত ভিন্ন জাতীয়া বুঝিতে হইবে। অস-বর্ণার গর্ভজাত সন্তান পৈতৃকধনের চতুর্থাংশ, স্থানবিশেষে সম-অধিকারী হয়। কেবল ব্রহ্মস্ব বণ্টন করিয়া অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। যখন স্ত্রীর অন্ন-গ্রহণ করা হইবে না, অনর্থক বিবাহ করা কেন? এই ভাবিয়া নেপালীরা প্রায়শঃ ভোগিনী রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার সন্তান পূর্ব্ববৎ বিবাহিতা অসবর্ণা গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় দায়ভাগে অধিকারী। এই সকল সন্তান পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া অশৌচ গ্রহণান্তে শ্রাদ্ধকালে অন্নের পরিবর্ত্তে যবের পিণ্ড দিবে। ব্রাহ্মণ-বিধবার গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক উৎপন্ন সন্তান একটী পৃথক্ শ্রেণীতে

আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে যোশী কহে; শুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের নাম উপাধ্যায়। ক্ষত্রিয় দুই প্রকার;— রাজবংশ ও সাধারণ। রাজবংশীয়েরা ঠকুরী ও সাধারণ ক্ষত্রিয়েরা খস্ নামে প্রসিদ্ধ। নেওয়ার জাতি এ দেশের বৈশ্য; উপনয়ন তাহাদের পক্ষে ইচ্ছাধীন। উপনীত হইলে মহিষ ও কুক্কুট মাংস এবং মদ্য-পান বর্জ্জন করিতে হয়। কামী নামক জাতি বৈশ্য হইলেও কোন অপরাধে রাজা কর্ত্তৃক অন্ত্যজ শ্রেণীতে গণ্য হইয়াছে। শূদ্রের মধ্যে জল আচরণীয় ও যাজ্য এবং তাহার অন্যথায় দুইটী শ্রেণী আছে; গুরঙ্গ, মগর, সোণার, পহারি, হায়ু ও কমারা বা দাসজাতি যাজ্য ও আচরণীয় শূদ্র। কামি, সার্কি, দময়ী, বাদী ও গাঁয়ী অনাচরণীয় ও অযাজ্য বা অন্ত্যজশূদ্র। আর এক শ্রেণীর লোককে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহাদিগকে আকাঙ্ক্ষিত শূদ্র বলা যাইতে পারে। আর্য্যীকরণ আকাঙ্ক্ষায় এই শ্রেণীকে চতুর্থবর্ণের মধ্যে গ্রহণ করা হইতেছে। লিম্বু ভোটিয়া, থামী ও জমিদার বা কিরাত্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা গো-খাদক, কিন্তু জল-আচরণীয় ও যাজ্য। প্রায়শঃ স্বজাতীয়ের দ্বারা ইহারা দৈব ও পৈতৃক কার্য্য করাইয়া থাকে। কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত আহ্বান করে। ব্রাহ্মণ জল-আচরণীয় জাতির কন্যায় আসক্ত হইয়া বা ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিয়া যে সন্তান উৎপাদন করে, সেই উভয় প্রকারের সন্তান ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয় ও ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে। অনাচরণীয় জাতিতে ব্রাহ্মণ সন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান মাতৃজাতি প্রাপ্ত হইবে; ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে না। কিন্তু ক্ষত্রিয় আচরণীয় জাতিতে অবৈধসন্তান উৎপাদন করিলে সেই সন্তান স্বজাতীয় মধ্যে গৃহীত হয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ই হইয়া থাকে; এবং অনাচরণীয় জাতির স্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের সন্তান জন্মিলে মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্য ও শূদ্র সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম বর্ত্তে। গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের মগর জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান গুরঙ্গ জাতি প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু গুরঙ্গ জাতীয় পুরুষের কামি জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান কামি জাতীয় হইবে, গুরঙ্গ হইতে পারিবে না। এতাবৎ দেখা যাইতেছে কোন নূতন নামধেয় সঙ্করজাতি নেপালে উৎপন্ন হয় না। যে সন্তান মাতৃজাতি প্রাপ্ত হয়, সে পিতৃধনের বা শ্রাদ্ধের অধি-কারী হইতে পারে না।

খৃষ্টীয় শক আরম্ভ হইবার পাঁচশত হইতে আটশত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গে আর্য্যনিবাস আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা এখানে আসিয়া (যেমন সর্ব্বত্র হইয়া থাকে) জাতিভেদের নূতনভাবে বিকাশ আরম্ভ করিলেন। বঙ্গে সৎশূদ্র ও নবশাখ নামে দুইটী ভেদ দৃষ্ট হয়। বঙ্গদেশের জাতিভেদের সম্মানের উপর তন্ত্র শাস্ত্রকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে দৃষ্ট হয়। তাহাতে তন্ত্রকে বাঙ্গালায় উৎপন্ন বলিয়া অনেকে জ্ঞান করেন। অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থ বঙ্গদেশে রচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মূল বেদের ন্যায় প্রাচীন। আর্য্যগণ পূর্ব্ব বাসস্থান হইতে ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাকে সমভিব্যাহারে আনয়নপূর্ব্বক পঞ্চনদ প্রদেশে অনার্য্য দ্রাবিড়গণের অসভ্য লিঙ্গপূজা দেখিয়া থাকিবেন। আর্য্য ও অনার্য্য মিশ্রিত হইয়া এক জাতিত্ব প্রাপ্ত হইলে বৈদিক রুদ্র ও অবৈদিক লিঙ্গ একীভূত হইয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। আলেক্‌জাণ্ডারের সহচরগণ ২০০ দুই শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে ভারতে লিঙ্গপূজা দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। এখন কাশ্মীর হইতে কুমারিকা ও আসাম হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত শিব-শক্তির আরাধনাকারী তান্ত্রিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৭০০ সাত শত খৃষ্টাব্দে রচিত মালতীমাধবে অঘোরঘণ্টিক কাপালিকের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬০০ ছয় শত খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ মত তন্ত্রের দ্বারা জর্জ্জরিত অবস্থা হইয়া তিব্বতে প্রবেশ করে। দশ শত খৃষ্টাব্দে তিব্বতীয়েরা তন্ত্রের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে থাকেন। ভারতে বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকমত একত্রিত হওয়ায়, বেদাচারীগণের নিকট বৌদ্ধগণকে ঘৃণার্হ করিয়া তুলে। তান্ত্রিক বামাচার পৈশাচিক অনার্য্যভাব অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। বামাচার সংস্কৃত হইয়া দক্ষিণাচারে পরিণত হইয়া আর্য্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী শূদ্র তন্ত্রের দ্বারা বিশেষ উপকৃত। নেপাল, তিব্বত ও চীনে যে বৌদ্ধমত প্রচলিত, তাহার নাম মহাযান। সিংহল, ব্রহ্ম, ও জাপানের বৌদ্ধমত আত্মা ও ঈশ্বর বর্জ্জিত। বৌদ্ধ সংস্কৃতে তাহাকে যেমন হীনযান বলিয়া থাকে, তদ্রূপ বামাচারীগণ আপনাদিগকে বীর ও দক্ষিণাচারীকে পশু বলিয়া পরিচিত করিতে ত্রুটি করেন না। বীরাচার কখন কাহাকেও নিষ্ঠাবান করিতে পারে না; অতএব পশ্বাচারীরাই ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত শূদ্রত্ব-প্রাপ্ত বাঙ্গালী সমাজকে সদাচারী হইতে শিক্ষা দিয়াছে।

বৈদিককালে সাধারণ আর্য্যগণ বিশ বা বৈশ্য নামে খ্যাত ছিলেন। বৈদে-

শিক আধিপত্যের বর্ত্তমান কালে তদ্রূপ জনসাধারণ শূদ্র নামে বিখ্যাত। অনেকে মনে করেন, শূদ্র বলিতে কেবল কৃষ্ণকায় দ্রাবিড় অনার্য্যকে বুঝায়, কিন্তু কেবল তাহারাই শূদ্র নহে। শূদ্র অনেক প্রকার। এখন বৈদিক কালের ন্যায় কেবল ভাষা ও বর্ণগত প্রভেদ নাই, স্থানীয় সম্প্রদায়গত, ব্যবসায়গত সমাজগত, ও বংশগত নানা ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। শূদ্রতত্ত্ব আলোচনা করিয়া সাত প্রকার শূদ্রের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ১ম--আদি বিভাগানু-যায়ী গুণকর্ম্মশালী অর্থাৎ উপযুক্ত স্বভাব ও ক্রিয়ান্বিত পূর্ব্বতন শূদ্র; যথা—কাহার। ২য়—আর্য্যীকরণে গৃহীত আদিম অধিবাসী কৃষ্ণকায় দ্রাবিড়;—যথা—চণ্ডাল। ৩য়—আর্য্যীকরণে গৃহীত নেপালী ও আসামী প্রভৃতি গৌরকায় মঙ্গোলীয়, যথা—গুরুঙ্গ প্রভৃতি। (৪র্থ—পাতিত্য হেতুক বা ক্রিয়ালোপপ্রযুক্ত বৃষলত্ব প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য; যথা—কায়স্থ প্রভৃতি। ৫ম—পিতৃত্যক্ত ও জারজ; যথা—রামজনী। ৬ষ্ঠ—দূষিত বৃত্তিজীবী বা অন্ত্যজ; যথা—চর্ম্ম-কার। ৭ম—যাহাকে অন্যবর্ণে স্থান দিতে পারা যায় না, এমন অতিরিক্ত জাতি; যথা—ভুটিয়া। শারীরিক লক্ষণানুসারে বঙ্গদেশীয় শূদ্র নামে খ্যাত উচ্চ শ্রেণীর জাতিগুলি দ্রাবিড় অপেক্ষা আর্য্যের সহিত অধিক ঘনিষ্ট। বেদে অনধিকারী হইয়া ইহারা দ্বিজজাতির সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছিল। তন্ত্র ইহাদিগকে উচ্চাসন দিয়াছে। ব্রাহ্মণ, শূদ্র সকলকেই তন্ত্র এক দেবতা, এক মন্ত্র ও এক গুরুর শিষ্য করিয়া দিল। বৈদিক সাবিত্রী প্রাপ্ত না হইলেও শূদ্রেরা তান্ত্রিক গায়ত্রী প্রাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণের পক্ষেও তান্ত্রিক গায়ত্রী না হইলে চলে না। শূদ্রের ক্রিয়া, কলাপ, আচার, ব্যবহার ব্রাহ্মণের পদ্ধতি অনুসরণ করিল। উত্তর ভারতের শূদ্র ও পূর্ব্ব ভারতের শূদ্র এখন আর এক নহে। আচার গুণে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আর আপনাদিগকে বেদে অনধিকারী জ্ঞান করিতে পারে না। উচ্চকণ্ঠে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১০ম অধ্যায়ে কহিতেছে;—"অস্মাকম্ বৈদিকং স্মার্ত্তং তথাগমিক মে বচ।" তান্ত্রিকগণ বেদ অপেক্ষা আগম নিগম ও যামলকে কোন প্রকারে নিকৃষ্ট জ্ঞান করেন না। বঙ্গদেশীয় শূদ্রের মধ্যে শূদ্র অপেক্ষা যে উৎকৃষ্ট বর্ণের লোক আছে, সৎশূদ্র বলিয়া একটি শ্রেণী থাকায় তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সৎশূদ্রের মধ্যে কি কারণে পতিত হইয়াছেন, কল্পনা ভিন্ন তাহার হেতু নির্ণয়

করিবার অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। হইতে পারে, আর্য্য সমাজে অনার্য্য-জাতি অধিকপরিমাণে প্রবেশ লাভ করায়, এক্ষণে শূদ্রের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে যখন বৈশ্যের ভাগ অধিক হওয়া উচিত ছিল, একেবারে তাহার লোপ সম্ভবপর নহে। অতএব বৈশ্য জাতি যে শূদ্রের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোককে অনুগত করিয়াছে, তাহার উৎপত্তি-স্থান পূর্ব্বভারতে। সেই ধর্ম্ম ঐ স্থানে যে অত্যন্ত প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না কি? এক্ষণে বৌদ্ধ কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বণিকের নাম দৃষ্ট হয়। বণিকশ্রেষ্ঠ জৈনেরাও বৌদ্ধ হইতে পৌরাণিক আচারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গদেশীয় বৈশ্যেরা বৌদ্ধমত গ্রহণ করায় ক্রিয়ালোপ ঘটিয়াছিল। সেই পাতিত্ব-নিবন্ধন আর পূর্ব্ব বর্ণে উন্নীত হইতে পারে নাই—এমন অনুমান করিবার হেতু আছে।

সৎশূদ্রের মধ্যে নবশাখ আর একটি অবান্তর ভেদ। ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দভট্ট বল্লালচরিত গ্রন্থে বল্লাল সেনের সময়ের প্রচলিত জাতি-কথায় লিখিয়াছেন;—

"গোপমালী চ তাম্বুলি কাংসারি তন্ত্রি শাংখিকাঃ।
কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥
তৈলিকো গান্ধিকো বৈদ্যঃ সৎশূদ্রাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সচ্ছূদ্রানান্ত সর্ব্বেষাং কায়স্থ উত্তম স্মৃতঃ॥"

লোকাচার অদ্যাপি প্রায় তদ্রূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। গুণ কর্ম্মানুসারে অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে নাপিত ও কায়স্থ ভিন্ন উপরোক্ত জাতি গুলি বৈশ্য বর্ণের বিভিন্ন শাখা। গোপ, মালী, তাম্বূলী, কাঁসারি, তন্তুবায়, শঙ্খকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, তৈলি, গন্ধবণিক ও বৈদ্যজাতির মধ্যে বৈদ্যগণ যে বৈশ্য, তাহা নিজ ক্ষমতায় প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকস্থলে সাধারণে স্বীকারও করিয়া থাকেন। সৎগোপেরা কহেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপ, সুতরাং বৈশ্য ছিলেন, অতএব সৎগোপগণ বৈশ্য। তন্তুবায়-ভ্রাতৃগণ কহেন, মনুতে লিখিত আছে, বস্ত্রবয়ন বৈশ্যের ধর্ম্ম, অতএব তাঁহারা

বৈশ্য। গন্ধবণিকগণ কহেন, তাহাদের নামের সহিত যখন বণিক শব্দ বিদ্যমান, তখন তাঁহারা অবশ্যই বৈশ্য। এই প্রকার যুক্তিবলে বৈশ্যত্ব প্রমাণিত করা সকলের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। পূর্ব্ব হইতে বলা হইতেছে, মূল একেবারে ধ্বংস হয় না। যে মূল অবলম্বনে বর্ণভেদ স্থাপন করা হইয়াছিল, নানা পরিবর্ত্তন রূপ আবর্ত্তের মধ্যে পতিত হইয়াও অদ্যাপি তাহা সজীব আছে। কে কোন্ বর্ণের মধ্যে স্থান পাইতে পারেন, তাঁহার সামাজিক সম্মান ও আচারের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্থিরীকৃত হইবে। গুণ কর্ম্ম অর্থে স্বভাব ও ক্রিয়া বলা হইয়াছে। আচার ও জীবিকা ক্রিয়ার অন্তর্গত। আচার ও জীবিকা দেখিয়া হিন্দুসমাজে জাতি—বিশেষের সম্মানের তারতম্য হয়। যে জাতিগুলি সাধারণ শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈশ্য বৃত্তিধারী, তাহারাই বৈশ্য। তাহাদের বৈশ্যত্ব নির্ণয়ের জন্য কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিবার আবশ্যক নাই। তাহাদের গুণকর্ম্ম স্বতঃসিদ্ধভাবে সেই জাতিগুলিকে বৈশ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের বৈশ্যত্ব প্রতিপন্ন করিতে হইলে, সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হওয়াই কর্ত্তব্য। বর্ণ বংশগত হইবার পূর্ব্বে যে ভাবে ছিল, এক্ষণে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই; এবং সেই ভাবটি সমাজের অতীব কল্যাণকর ও বৈজ্ঞানিক। অতএব বঙ্গে গুণকর্ম্মানুসারে বৈশ্য নির্ণয় করা উচিত। বৈশ্যের সকল ক্রিয়াকলাপ নবশাখের মধ্যে অনেকের বিদ্যমান নাই। যে গুলির অভাব আছে, পূরণ করিয়া লইতে হইবে। তজ্জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ব্যবস্থা লইয়া আনুষ্ঠানিক বৈশ্য হইতে হইবে। নিম্নলিখিত ব্যবস্থা-পত্রে স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন স্বাক্ষর করিতে সম্মত ছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন, ইহা অশাস্ত্রীয় নহে, স্মৃতিশাস্ত্র-ব্যবসায়ী সকলেই ইহাতে স্বাক্ষর করিতে পারেন, কিন্তু কেবল স্বাক্ষর করাইয়া কোন লাভ নাই। যে জাতি বৈশ্যের সকল ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অগ্রে কর্ত্তব্য পালনের জন্য সমগ্রজাতি একমত হউন—নতুবা কতিপয় ব্যক্তি অগ্রসর হইলে সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে।

সঙ্কল্পিত ব্যবস্থা।

পরমপূজনীয়াশেষশাস্ত্রাধ্যাপক-
মহাশয়গণ সমীপেষু।

প্রশ্ন :—

সৎশূদ্রগণ, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে বৈশ্যত্ব-লাভ ও বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ-গ্রহণ এবং অন্যান্য কর্ম্ম করিতে পারেন কি না? ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এই বিষয়ের ব্যবস্থা প্রদান করুন।

অস্যোত্তরং—

বৈশ্যত্বব্যাপ্যং বৈশ্য-গুণ-কর্ম্ম, অতোবৈশ্য-গুণ-কর্ম্ম-ভ্যাং ইদানীমপি বঙ্গদেশীয়াঃ প্রায়ঃ সৎশূদ্রাঃ বৈশ্যত্বং প্রাপ্তুমর্হন্তি। যথাশাস্ত্রমাচরদ্ভি-দ্বিজ-শুশ্রূষাকারিভিঃ শূদ্রৈর্গুণকর্ম্মানুসারেণ বৈশ্যসমান ধর্ম্মতয়া জননমরণাদৌ মন্বাদিশাস্ত্রতো বৈশ্যবৎ পঞ্চদশদিনাশৌচং গ্রহণীয়ং, এবমন্যানি চ কর্ম্মাণি তদ্বদনুষ্ঠেয়ানীতি সতাং মতং।

গুণ-কর্ম্মানুসারেণ বৈশ্যত্বং ইত্যস্য প্রমাণং শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে অর্জ্জুনং প্রতি ভগবদ্-বাক্যং—

"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।"

কেবলকর্ম্মণাপি শ্রেষ্ঠত্বাপকৃষ্টত্বং গতাঃ

অত্র প্রমাণং মহাভারতে—

"কর্ম্মণা বর্ণতাং গতাঃ।"

অত্রাপি-গুণ-কর্ম্মভ্যাং উচ্চৈস্ত্বং নীচৈস্ত্বং প্রাপ্তা-শ্চত্বারোবর্ণাঃ। যথা মনু-সংহিতায়া দশমাধ্যায়ে ভগবান্ মনুরাহ—

"শূদ্রোব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈবচ॥" ইত্যাদি।

ইদানীং সৎশূদ্রাণাং কর্ত্তব্য-নির্ণয়ো মনুসংহিতায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়ে তেনৈবোক্তং—

"শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টস্তু ভোজনং॥"

স্মার্ত্তমহামহোপাধ্যায়-রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যৈরেতদ্বচন-স্থিত'চ'কারেণ (অর্থাৎ বৈশ্যবৎ শৌচ-কল্পশ্চেতি চকারেণ) যথা-শাস্ত্র-ব্যবহারিণাং দ্বিজ-শুশ্রূকানাং শূদ্রাণাং বৈশ্যসাকল্য ধর্ম্মোব্যবস্থিতঃ।

যথা শুদ্ধি-তত্ত্বে—

"চকারাদ্বৈশ্য-ধর্ম্মাতি-দেশেন।"

যথা উদ্বাহতত্ত্বে চ—

"চকার সমুচ্চিতগোত্রেঽপি বৈশ্যধর্ম্মাতিদেশাৎ॥"

ইদানীং বিশাং ধর্ম্মো নিরূপ্যতে।

মনুসংহিতায়াঃ প্রথমাধ্যায়ে যথা—

"পশূনাং রক্ষণং দানং ইজ্যাধ্যয়নমেব।
বণিক্ পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥"

ইজ্যা যজনমিত্যর্থঃ।

অত্রাধ্যয়নশব্দেন পুরাণতন্ত্রপঠনার্থোপি গৃহ্যতে।

ততশ্চ ইদানীমপি বঙ্গ-দেশীয়ানাং প্রায়ঃ সৎশূদ্রাণাং এষঃ মনুসংহিতায়াঃ প্রথমোধ্যায়োক্ত ধর্ম্মোদৃশ্যতে। যথাবিধি আচরণশীলানাং ব্রাহ্মণাদিশুশ্রূষকাণাং শূদ্রাণাং স্বজাতিত উত্তমবর্ণত্বং প্রাপ্নোতি। অত্র প্রমাণং মানবে নবমাধ্যায়ে—

"শুচিরুৎকৃষ্টশুশ্রূষুর্ম্মৃদুবাগমহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাদ্যাশ্রয়োনিত্যমুৎকৃষ্টাং জাতিমশ্নুতে॥"

শুচিরিতি। বাহ্যাভ্যন্তরশৌচোপেতঃ স্বজাত্যপেক্ষয়া উৎকৃষ্টদ্বিজাতি-পরিচরণশীলোঽপরুষভাষী নিরহঙ্কারঃ, প্রাধান্যেন ব্রাহ্মণাশ্রয়ঃ তদভাবে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাশ্রয়োঽপিস্বজাতিত উৎকৃষ্টাং জাতিং প্রাপ্নোতি ইতি কুল্লুকভট্টেন ব্যাখ্যাতং।

যৎ তু শুদ্ধি তত্ত্বেঽভিহিতং—
দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমগ্র্যং
স্বগোত্রধর্ম্মং ন হি সন্ত্যজেচ্চ।"

তৎসঙ্গত্যনুসারেণ সামঞ্জস্যং বিধাতব্যং।
বক্ষ্যমাণ-মৎস্যপুরাণীয় শাতাতপবচনাৎ যথা—
"দেশং কালং তথাত্মানং দ্রব্যং দ্রব্য-প্রয়োজনং।
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞাত্বাশৌচং প্রকল্পয়েৎ॥"
যৎ তু শুদ্ধিতত্ত্বে—
"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
এবঞ্চক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা।"

তৎকলেৰ্নিন্দাপরং। ন তু শুচিরিত্যাদি মনুবচনস্থস্য এতাদৃশগুণযুক্তস্য সৎশূদ্রস্য বৈশ্যত্বাভাবপরং।

তিথিতত্ত্বে—

বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তিসৰ্ব্বে কলৌ যুগে।

ইতি মৎস্যপুরাণীয়বচনং যদ্বৎকলের্নিন্দাবোধকং তদ্বৎ শনকৈস্ত্বিতি অনুমেয়ং ধৰ্ম্মদর্শিভিঃ।

যৎ তু মিতাক্ষরায়াং—

"অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধৰ্ম্মমপ্যাচরেন্ন তু।"

তৎ শুচিরিত্যাদিবচনস্থস্য উৎকৃষ্টাং জাতি-মশ্নুতে ইতি ন্যায়বৰ্ত্তিশূদ্রাণাং লোকাচার-বিরুদ্ধমপি।

"তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ।"

ইতি প্রয়োগপারিজাতধৃতস্মৃতি বচনাৎ স্মৃতি-বাক্য-লৌকিক-বাক্যয়োর্ব্বিরোধে স্মৃতিবাক্যং গ্রাহ্যং। এবমন্যেষাং বিরুদ্ধবচনানাং সামঞ্জস্যার্থং ব্যাখ্যাতব্যং বুধৈঃ।

[অনুবাদ।—বৈশ্য-গুণ ও কৰ্ম্ম বৈশ্যত্বকে আশ্রয় করে। অতএব বৈশ্যের গুণাশ্রয় ও কৰ্ম্মানুষ্ঠান করাতে ইদানীন্তন কালেও বঙ্গদেশীয় প্রায় সমস্ত সৎ শূদ্রই বৈশ্যত্ব লাভ করিতে পারেন। যথাশাস্ত্র আচরণ করত দ্বিজ-শুশ্রূষাকারী শূদ্রগণ গুণ ও কৰ্ম্মানুসারে বৈশ্যতুল্য ধৰ্ম্মহেতু জনন ও মরণাদি স্থলে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রে কথিত পঞ্চদশ দিন অশৌচ গ্রহণ এবং বৈশ্যের ন্যায় কৰ্ম্ম সকল করিতে পারেন, ইহাই পণ্ডিতদিগের মত।

এ বিষয়ে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের উক্তিই প্রমাণ। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন, আমি গুণ ও কৰ্ম্মানুসারে চতুর্ব্বর্ণ

(অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র জাতির) সৃষ্টি করিয়াছি। মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষ-ধর্ম্ম-পর্ব্বাধ্যায়েও কথিত হইয়াছে যে,—কেবল কর্ম্ম দ্বারাও বর্ণত্ব (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রত্ব) লাভ হয়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই শ্রেষ্ঠত্ব ও অপকৃষ্টত্ব লাভ করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়েও আছে। মনু বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে, ব্রাহ্মণগণও শূদ্রত্ব লাভ করে। ক্ষত্রিয় সমস্ত শূদ্রত্ব লাভ করিতে পারে; শূদ্রও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে পারে এবং বৈশ্য সমূহ শূদ্র-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়; শূদ্রগণও বৈশ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।

শুদ্ধিতত্ত্বে ও উদ্বাহতত্ত্বে মহামহোপাধ্যায় স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন;—মনুসংহিতার ৫ অধ্যায়ে সৎশূদ্রের কর্ত্তব্যনির্ণয়প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণগণের সেবাপরায়ণ শূদ্রসমূহ প্রতি মাসিক কেশাদি মুণ্ডন করিবে এবং জননাশৌচে ও মরণাশৌচে বৈশ্যের ন্যায় অশৌচ প্রতিপালন করিবে ও ব্রাহ্মণগণের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিবে। এই বচনস্থিত "চ-কার" দ্বারা যথাশাস্ত্র-ব্যবহারী ও দ্বিজ-শুশ্রূষক শূদ্র সম্বন্ধে বৈশ্যের সমস্ত ধর্ম্মই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এক্ষণে মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে বৈশ্যদিগের যে ধর্ম্ম নিরূপণ করা হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। পশুদিগের প্রতিপালন, দান, যজন, পুরাণ ও তন্ত্রাদি পাঠ, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, ধন বৃদ্ধির নিমিত্ত সুদ গ্রহণ ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যদিগের ধর্ম্ম বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আধুনিক বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ সৎ শূদ্রেই উক্ত ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে।

যথাশাস্ত্র-ব্যবহারকারী ব্রাহ্মণাদির শুশ্রূষক শূদ্র স্বীয় জাতি হইতে উচ্চ জাতি প্রাপ্ত হয়েন, এ বিষয়েরও প্রমাণ মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে দৃষ্ট হইতেছে। কুল্লূক ভট্ট সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, বাহ্য এবং অভ্যন্তরে শুচি, ও স্বজাতির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতির শুশ্রূষক, এবং অহঙ্কারশূন্য ও মিষ্টভাষী, প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের প্রাধান্য বশতঃ ব্রাহ্মণাশ্রিত, তদভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের আশ্রিত যে শূদ্র, সে উক্ত গুণাদি দ্বারা স্ব স্ব জাতি হইতে উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হয়।

ইদানীং বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া মীমাংসা সংস্থাপন করিতেছি। শুদ্ধি-